আট আনা সংস্করণ কোহিনুর গ্রন্থাবলী নং ১

তপস্যা

যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন প্রণীত

কলিকাতা
১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত
এবং
৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৩২৫

মূল্য ৷৷৹ আট আনা

আমাদের আট আনা সংস্করণ

॥০—কোহিনুর গ্রন্থাবলী—॥০

এই সিরিজে প্রতি মাসে অন্ততঃ একখানি করিয়া পুস্তক প্রকাশিত হইবে। ইহাতে শুধু উপন্যাসই প্রকাশিত হইবে না—

উপন্যাস, গল্প, রূপকথা, রসকথা, জীবনী, ইতিহাস,

সকল প্রকার পুস্তকই স্বতন্ত্রভাবে

বাহির করা হইবে।

কোহিনুর গ্রন্থাবলীর

প্রথম গ্রন্থ

তপস্যা

বাহির হইয়াছে।
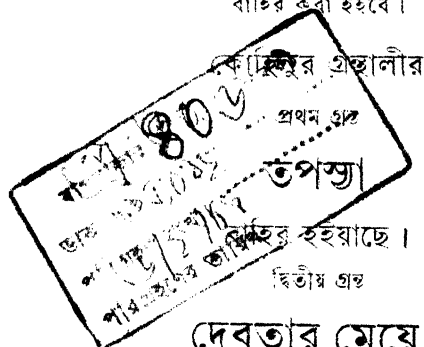
দ্বিতীয় গ্রন্থ

দেবতার মেয়ে।

তৃতীয় গ্রন্থ

চিত্রকর।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

৬০নং কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ছোটবাজার,
ময়মনসিংহ।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণম

উৎসর্গ পত্র।

আমাদের জাতীয় জীবনের জাগরণের দিনে,

আমাদের জাতীয় উন্নতির ভরসাস্থল,

আমার ভ্রাতা ও পুত্রস্থানীয়,

বঙ্গীয় যুবকগণের

করকমলে

অর্পণ করিলাম।

কৃষ্ণনগর
১৭ই আষাঢ়
১৩২৫

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

ভূমিকা।

আমাদের হিন্দুজাতি একসময়ে পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য ও পারমার্থিক সম্পদে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল, একথা সকলেই স্বীকার করেন। যে প্রকার সাধনা বলে হিন্দুজাতি এই উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমি সেই সাধনার নাম দিয়াছি 'তপস্যা'। এই তপস্যা দ্বারা প্রাচীনকালে হিন্দুজাতি সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, আবার বর্ত্তমান সময়েও জাতীয় উন্নতিলাভ করিতে হইলে আমাদিগকে সেই একই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। স্যাণ্ডো-রামমূর্ত্তি প্রভৃতি জগদ্-বিখ্যাত মল্লবীরগণ বলেন, মানসিক বলই তাঁহাদের অসাধারণ শারীর-বল-লাভের একমাত্র কারণ। যে সকল প্রতিভাশালী মহাত্মা দর্শন-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্পাদিতে নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা জগতের জ্ঞান-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতেছেন তাঁহাদের কৃতিত্বের মূলেও মানসিক একাগ্রতা ও অধ্যবসায় বিদ্যমান। আর যাঁহারা আত্মার কল্যাণের জন্য ঈশ্বরোপাসনা বা যোগমার্গের আশ্রয় করেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই। সুতরাং যেদিকেই দেখা যায়, জাতীয় উন্নতি লাভের জন্য আমাদিগকে শারীরিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার উপরে মানসিক শক্তিসঞ্চয়ের স্থান দিতে

হইবে। এই প্রাচীন জীবন-ধারা হইতে বিচ্যুত হইয়া আমাদিগের কোনপ্রকার উন্নতিলাভ সম্ভবপর নহে। সর্ব্বোপরি ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভগবদারাধনা হিন্দুজাতির সর্ব্বপ্রকার সাধনার মূলমন্ত্র। ইহকালসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার কুহকে ভুলিয়া আমরা যেন সেই প্রাচীন ধারা হইতে ভ্রষ্ট না হই। ইতি

গ্রন্থকার

সূচীপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা।
১।	বিশ্বামিত্রের তপস্যা	১
২।	ত্রিবিধ জীবন	৫৯
৩।	জাতীয়তা ও বিশ্বমানবতা	৭৮
৪।	শরতের প্রকাশ	৯০
৫।	উমার তপস্যা	৯৭
৬।	সাহিত্যে মৌলিকতা	১১৯
৭।	সর্ব্বানন্দের সিদ্ধিলাভ	১২৯

তপস্যা

বিশ্বামিত্রের তপস্যা*

আখ্যায়িকা

রামায়ণের, বালকাণ্ডে বর্ণিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের জীবনবৃত্তান্ত হইতে আমরা আমাদের বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারি। সেজন্য সকলের স্মরণার্থে সেই অমিততেজাঃ মহর্ষির আখ্যায়িকা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

---

* গত ১৩১১ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে কলিকাতা সাবিত্রী লাইব্রেরীর চতুর্বিংশতিতম সাংবাৎসরিক অধিবেশনে, ৺চন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে, লেখককর্ত্তৃক পঠিত ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত উক্ত সনের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত।

সকলেই জানেন বিশ্বামিত্র একজন প্রবল পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন.। তিনি এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে বহির্গত হইয়া একদিন অগ্নিতুল্যতেজস্বী, তপঃসিদ্ধ ব্রহ্মকল্প মহর্ষি বসিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বসিষ্ঠ তাঁহার যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয় আশ্রমে সদলবলে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। বিশ্বামিত্র অনেক পীড়াপীড়ির পর সম্মত হইলেন। কিন্তু এত লোকের খোরাক জোগান ত সহজ ব্যাপার নয়? মহর্ষি বসিষ্ঠের সে জন্য কোন চিন্তার কারণ ছিল না। তাঁহার শবলানাম্নী কামধেনুকে ডাকিয়া বলিলেন—"শবলে! আমি রাজা বিশ্বামিত্রকে সসৈন্যে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, তুমি ইঁহাদের প্রত্যেকের অভিরুচি অনুসারে চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়াদি দ্বারা সৎকার কর।" আজ্ঞা পাওয়া মাত্র শবলা তাহার ব্যবস্থা করিল। বিশ্বামিত্র এইরূপে সসৈন্যে পরিতর্পিত হইয়া সাতিশয় আনন্দিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি ক্ষত্রিয় রাজা। এই গাভীটির অদ্ভুত গুণপনা দেখিয়া তাহার প্রতি বিশ্বামিত্রের অত্যন্ত লোভ জন্মিল। তিনি বসিষ্ঠকে বলিলেন "হে ঋষিবর! আপনাকে আমি সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু একটি কথা। আপনি আমার নিকট হইতে একলক্ষ গাভী গ্রহণ করিয়া তাহাদের বিনিময়ে শবলাকে অর্পণ করুন। আর দেখুন, আমি রাজা, এই গাভীটি একটি রত্নবিশেষ। পৃথিবীতে যাবতীয় ধনরত্নের একমাত্র রাজাই অধিকারী।" অর্থাৎ আমি যদি জোর করিয়া এই গোরুটি

তোমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লই, তবে তুমি কি করিতে পার ? মহর্ষি বসিষ্ঠ কিন্তু এই রাজকীয় যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন "এই যে গাভীটি দেখিতেছেন, ইহা আমার অত্যন্ত প্রিয় এমন কি আমার যথাসর্ব্বস্ব। আমাকে কোটী কোটী সুবর্ণমুদ্রা দিলেও আমি ইহাকে ছাড়িতে পারিব না।" কিন্তু বিশ্বামিত্রও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন "আমি আপনাকে সুবর্ণালঙ্কারভূষিত চতুর্দ্দশ সহস্র হস্তী, একসহস্রদশটি ঘোড়া, এবং এককোটী গোরু, এতদ্ভিন্ন আপনি সোঁণারূপা যত চাহেন তত দিতে প্রস্তুত আছি, আমাকে শবলা প্রদান করুন।" রাজার এই হাজারহাজার, লক্ষলক্ষ, কোটীকোটী দানের প্রস্তাবে একটুও আটকাইল না, কারণ তিনি একজন ভয়ানক diplomatist (কৌশলী), তিনি জানেন একবার শবলাকে হস্তগত করিতে পারিলে হুকুম করিলেই ত যাহা ইচ্ছা তাহাই তৎক্ষণাৎ সে দিতে পারিবে। এরূপ অবস্থায় কোটীকোটী দানের অঙ্গীকার কে না করিতে পারে ?

যাহাহউক, মহর্ষি বসিষ্ঠ কিন্তু এ প্রস্তাবেও সম্মত হইলেন না। শবলাও রাজার সঙ্গে যাইতে একেবারে অনিচ্ছুক। সে মুনির পদতলে পতিত হইয়া দুই চোখের জল ছাড়িয়া দিল। বিশ্বামিত্র গোরু না পাইয়া ভয়ানক চটিয়া গেলেন এবং প্রবল বলদর্পে দৃপ্ত হইয়া যুদ্ধং দেহি বলিয়া বসিষ্ঠের সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। বসিষ্ঠের আদেশে শবলা যোগবলে অনেকানেক কাম্বোজ বর্ব্বর যবন শক হারীত কীরাতাদি ম্লেচ্ছসৈন্য সৃষ্টি করিয়া ফেলিল।

তাহারা তৎক্ষণাৎ গজবাজিরথের সহিত বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য নির্ম্মূল করিয়া ফেলিল। তখন বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র বসিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তিনি হুঙ্কার দ্বারা তাহাদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। বিশ্বামিত্র এইরূপে পরাস্ত হইয়া বড়ই লজ্জিত হইলেন। কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি একটি পুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া মহাদেবের প্রসাদার্থ হিমালয়ে গিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। পশুপতি তাঁহার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথাভিলষিত ধনুর্ব্বেদ অর্পণ করিলেন। বলাবলিপ্ত বিশ্বামিত্র তখন বসিষ্ঠাশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া আবার যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের সহিত আবার তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠকে কোন রকমে আঁটিতে না পারিয়া অবশেষে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। বসিষ্ঠ স্বীয় ব্রহ্মতেজঃ প্রভাবে সেই ব্রহ্মাস্ত্রও গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। বিশ্বামিত্র এইরূপে পুনঃপুনঃ পরাস্ত ও অপদস্থ হইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—

> "ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং।
> একেন ব্রহ্মদণ্ডেন সর্ব্বাস্ত্রাণি হতানি মে॥
> তদেতৎ প্রসমীক্ষ্যাহং প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ।
> তপোমহৎ সমাস্থাস্যে যদ্বৈ ব্রহ্মত্বকারণম্॥"

আমার ক্ষত্রিয় বলকে ধিক্! ব্রহ্মতেজই প্রকৃত বল। এক ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা আমার সমস্ত অস্ত্র বিনষ্ট হইল! আমি ইহা

সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ইন্দ্রিয়-মনকে সংযত করিয়া আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইব। কারণ একমাত্র তপঃই ব্রহ্মত্বের কারণ।

ইহাই বিশ্বামিত্র-জীবনের এক মহাসন্ধিমুহূর্ত্ত। এখন হইতে তাঁহার এক নবজীবনের সূত্রপাত হইল। তিনি এই বজ্রকঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া দক্ষিণদেশে গমনপূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এইরূপে এক সহস্র বর্ষ অতীত হইলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন "হে কৌশিক! তোমার এই তপস্যার ফলে আমি তোমাকে "রাজর্ষি" বলিয়া গণ্য করিলাম।" বিশ্বামিত্র একথা শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। "কি? এত তপস্যার পরেও আমি ব্রাহ্মণ হইতে পারিলাম না? আমি এখনও রাজর্ষি? আচ্ছা আবার দেখা যা'ক।" ইহা বলিয়া তিনি আবার ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড বাধিল। আজকাল সজীব তেজোবলদৃপ্ত পাশ্চাত্যজাতীয়দের নানাবিষয়ে খেয়াল যাইতেছে। কেহ পদব্রজে সমস্ত পৃথিবীটা প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছেন। কেহ বা বাইসিকেলে চড়িয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভূপ্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছেন। কেহ বা পকেটে একটি মাত্র কাণা-কড়িও সম্বল না লইয়া সমগ্র পৃথিবী বেড়াইয়া আসিতেছেন। কেহ বা শুদ্ধ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া হিমানীমণ্ডিত গিরিশিখর উত্তীর্ণ হইতেছেন। এখন পাশ্চাত্য জাতি নবযৌবনবলে বলীয়ান্‌, তাঁহারা কোন বিপদ্‌কেই বিপদ বলিয়া গণ্য করেন

না, তাই নিত্য নূতন খেয়াল আসিয়া তাঁহাদের ঘাড়ে চাপে। হিন্দুজাতিরও এইরূপ একদিন গিয়াছে। যখন হিন্দু-জাতির হৃদয়ে জীবনীশক্তি খরবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, তখন কখন কখন এক একজনের কোন বিষয়ে খেয়াল উপস্থিত হইত। এইরূপে ত্রিশঙ্কু নামক একটি রাজার এক অদ্ভুত রকমের খেয়াল উপস্থিত হইল—তিনি সশরীরে স্বর্গ-গমন করিবেন! বেলুন যন্ত্রটা আবিস্কৃত হইয়া থাকিলে তাঁহার এই সখ সহজেই মিটিতে পারিত, কিন্তু সেরূপ কোন সহজ উপায় না দেখিয়া তিনি বসিষ্ঠ ঋষির নিকটে গিয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ঋষি তাঁহাকে নিতান্ত বাতুল মনে করিয়া হাঁকাইয়া দিলেন। তখন তিনি বসিষ্ঠের পুত্রগণের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারাও কিন্তু ত্রিশঙ্কুর বুদ্ধিবৃত্তির সমধিক প্রশংসা করিতে পারিলেন না। অধিকন্তু, ত্রিশঙ্কু তাঁহাদিগকে শক্ত শক্ত দু'কথা শুনাইয়া দিলে, তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাপ দিলেন "তুই বেটা চণ্ডাল হ।" তাঁহাদের অভিশাপের ফলে যথার্থই ত্রিশঙ্কু এক রাত্রির মধ্যে চণ্ডাল হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন ক্রোধ ও ক্ষোভে অভিভূত হইয়া বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলেন। বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে অভয় প্রদান করিয়া তাঁহার মনস্কামনাসিদ্ধির জন্য এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, এবং যাবতীয় মুনিঋষিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার আহ্বানে অনেক ঋষিই যজ্ঞে আসিলেন, কেবল আসিলেন না বসিষ্ঠ, তাঁহার পুত্রগণ এবং মহোদয়নামা ঋষি। বসিষ্ঠপুত্রগণ বলিয়া পাঠাইলেন "যে রাজা স্বয়ং

চণ্ডাল, যাহার যাজক ক্ষত্রিয়, আমরা তাহার যজ্ঞে যাইব? কখনই না।"

বিশ্বামিত্র এই কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে কঠোর শাপে অভিশপ্ত করিলেন। তখন অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া সেই মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু দেবগণ সে যজ্ঞে আসিলেন না। তখন বিশ্বামিত্র রোষাবিষ্ট হইয়া ত্রিশঙ্কুকে বলিলেন, "দেখ! আমার তপস্যার প্রভাব দেখ! আমি চাই না কোন দেবতাকে, আমি নিজেই আমার তপঃপ্রভাবে তোমাকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাইতেছি।" বিশ্বামিত্রের সেই সহস্রবর্ষব্যাপী তপস্যার ফল বৃথা যায় নাই। বাস্তবিকই তাঁহার তপোবলে ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করিলেন। কিন্তু দেবতারা ত পূর্ব্বেই চটিয়া আছেন। তাঁহারা ত্রিশঙ্কুকে trespasser (অনধিকার প্রবেশকারী) বলিয়া স্বর্গ হইতে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ত্রিশঙ্কু হেটমুণ্ডে মর্ত্যালোকে অবতরণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার না এদিক না ওদিক। যাহাহউক বিশ্বামিত্রও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন, "বটে? দেবতারা ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে স্থান দিলেন না? আমি দেখিব তাঁহারা কোথাকার কেমন দেবতা। আমি নিজেই এক দেবলোক সৃষ্টি করিব।" ইহা বলিয়া তিনি তপঃপ্রভাবে একটি নূতন স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে অপর সপ্তর্ষিমণ্ডল, এবং অপর নক্ষত্র মালা সৃষ্ট হইল। পরে যখন দেবসৃষ্টি আরম্ভ করিলেন, তখন স্বর্গস্থ দেববৃন্দের মধ্যে

কান্নাকাটী পড়িয়া গেল। মর্ত্তালোকের যজ্ঞে তাঁহাদের চিরকালের হবির্ভক্ষণের সাধটা যে একেবারেই রহিত হইয়া যায়। পরিশেষে সুরাসুরগণ মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ করিয়া বিশ্বামিত্রের তোষামোদ আরম্ভ করিলেন। উভয় দলের মধ্যে একটা মিটমাট হইল। বিশ্বামিত্রের অনুরোধে দেবগণ ত্রিশঙ্কুকে চিরকালের জন্য সশরীরে স্বর্গসুখভোগ করিবার অনুমতি প্রকাশ করিলেন। আর চিরকালের জন্য, বিশ্বামিত্রসৃষ্ট-নক্ষত্রমালা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে এরূপ রফা হইল।

এই সব গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া বিশ্বামিত্রের তপস্যার বিঘ্ন হইল। তিনি দক্ষিণদেশ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমদেশে, পুষ্করতীর-বর্ত্তী এক বিশাল তপোবনে আবার তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সেখানেও আর এক বিঘ্ন উপস্থিত হইল। অযোধ্যাধিপতি অম্বরীষ রাজা এক বৃহৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার চিরদিনের অসংশোধনীয় স্বভাববশতঃ সেই যজ্ঞের পশু চুরি করিলেন। রাজার পুরোহিত সেই অপহৃত পশুর পরিবর্ত্তে একটি নরশিশু আনিয়া বলি দিতে অনুজ্ঞা করিলেন। রাজা তখন অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে ঋচীক নামক এক মুনিনামধারী নরপশুর শুনঃশেফ নামক মধ্যম পুত্রকে অনেকগুলি টাকা কড়ি ও গোরু দিয়া ক্রয় করিলেন। সে শিশুটি বড়ই বুদ্ধিমান ও ধীরপ্রকৃতি ছিল। সে পথিমধ্যে বিশ্বামিত্রের দর্শন পাইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। বিশ্বামিত্র তখন তাঁহার নিজ পুত্রদিগকে সেই রাজযজ্ঞে বলি হইয়া অগ্নির তৃপ্তিসাধন করিতে আদেশ দিলেন।

বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ রামাবতারের যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও, তাহাদের বুদ্ধিটা এই বিংশ শতাব্দীর পুত্রগণের বুদ্ধির ন্যায় অত্যন্ত প্রখর ছিল। তাহারা বিশ্বামিত্রকে নিতান্ত old fool (বৃদ্ধ বাতুল) জ্ঞান করিয়া তাঁহার আদেশ হাসিয়া উড়াইয়া দিল। কিন্তু সেই মহাতেজস্বী মহাপ্রাণ ঋষি তাহাদিগকে ক্ষমা না করিয়া কঠোর শাপে অভিশপ্ত করিলেন। এবং সেই শিশুটিকে তাহার উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিলেন। তাঁহার উপদেশে সেই বালকটি অগ্নি, ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে স্তব করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিল। বিশ্বামিত্র সেই পুষ্করতীরে এক সহস্র বৎসর তপস্যা করিলে ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন, "বিশ্বামিত্র, তুমি এখন 'ঋষি' হইয়াছ।"

বিশ্বামিত্র ঋষি হইয়াও সন্তুষ্ট নহেন—তিনি হইতে চান ব্রহ্মর্ষি—ব্রাহ্মণ। তিনি আবার কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে স্বর্গাপ্সরা মেনকা আসিয়া তাঁহার তপোবিঘ্ন উৎপাদন করিল। তিনি কামমোহের অধীন হইয়া দশ বৎসর তাহার সঙ্গে যাপন করিলেন। কিন্তু পরে আবার অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া হিমাচলে গমনপূর্ব্বক কৌশিকীতীরে মহাকঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এবার ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন "বিশ্বামিত্র! তুমি এতদিনে মহর্ষি হইলে।"

বিশ্বামিত্র ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন, তিনি তখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই। তিনি আবার তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি ঊর্দ্ধবাহু, নিরবলম্বন, বায়ুভক্ষণ, গ্রীষ্মে পঞ্চতপাঃ, শিশিরে সলিলশায়ী, বর্ষায় অনাচ্ছাদিতমস্তক হইয়া সহস্রবর্ষব্যাপী ঘোরতর

তপস্যা করিলেন। ইন্দ্র তাঁহার তপস্যায় ভীত হইয়া, তাঁহার তপোভঙ্গের জন্য রম্ভাকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এবার বিশ্বামিত্রকে আঁটিতে পারে কাহার সাধ্য? তিনি ক্রোধভরে রম্ভাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। কিন্তু সে কাজটাও ভাল হইল না। এইরূপে ক্রোধপরবশ হওয়াতে তিনি সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। তিনি পুনর্ব্বার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পুনঃপুনঃ কঠোর তপস্যার ফলে ক্রোধাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রশমিত হইল। একদিন তিনি একটি সহস্রবর্ষানুষ্ঠিত অনশনব্রত পূর্ণ করিয়া অন্নভোজন করিতে উদ্যত হইলে, ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে সেই অন্নভিক্ষা করিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহার প্রতি একটুও ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অন্ন তাঁহাকে দান করিয়া পুনর্ব্বার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবার নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া সহস্রবর্ষ তপস্যা করিলেন। তখন তাঁহার মস্তক হইতে সধূম অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল। সেই অগ্নির তেজে ত্রিভুবন সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। দেবঋষি গন্ধর্ব্বপন্নগাদি সুরাসুরগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও তেজোহীন হইয়া পড়িলেন। চতুর্দ্দিক্ তমোব্যাপ্ত হইল। স্বয়ং ভাস্কর নিষ্প্রভ হইলেন। সাগর সকল ক্ষুভিত হইল, পর্ব্বতমালা বিশীর্ণ হইল, সমস্ত পৃথিবী মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিল। সৃষ্টিনাশ হওয়ার উপক্রম দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ বিশ্বামিত্রকে অভীষ্টবর প্রদান করিতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন—

"ব্রহ্মর্ষে স্বাগতঃ তেঽস্তু তপসাস্মস্সুতোষিতাঃ।
ব্রাহ্মণ্যং তপসোগ্রেণ প্রাপ্তবানসি কৌশিক ॥"

হে ব্রহ্মর্ষে! আপনাকে সাদরসম্ভাষণ করিতেছি। আপনার তপস্যাতে আমরা সকলে বিশেষরূপে পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে কৌশিক! আপনি উগ্রতপস্যাবলে আজ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন।

বিশ্বামিত্র এইরূপে বহুযুগব্যাপী কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে বসিষ্ঠাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে কি বৈরনির্য্যাতনের জন্য? তাহা নহে। তিনি বসিষ্ঠের পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার পূজা করিলেন। এখন বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় নহেন—এখন তিনি ব্রাহ্মণ।

কোন কোন সমালোচকের মতে রামায়ণের বালকাণ্ডটি মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত নহে—উহা প্রক্ষিপ্ত। তাহার একটি প্রমাণ, এই বিশ্বামিত্র-উপাখ্যানে অতিমাত্রায় ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে। ইহা কোন স্বার্থলুব্ধ ব্রাহ্মণের কারসাজি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কিন্তু আমি অন্যরূপ বুঝি। এই বালকাণ্ডটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার অন্য কারণ থাকিলে, তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এই বিশ্বামিত্রোপাখ্যানে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়াই যে, বালকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। আমার মতে বরং ব্রাহ্মণ পদবীটা লাভ করা যে নিতান্ত সুখসাধ্য নহে, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হইলে কত কঠোর তপস্যার আবশ্যক, ব্রাহ্মণ্যসভ্যতার standard of culture (অনুশীলনের পরিমাণ) কত উচ্চ ছিল, ইহাই এই উপাখ্যানে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে অন্যান্য জাতির শীর্ষদেশে ব্রাহ্মণের স্থান কেন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল? ব্রাহ্মণের

পাশবশক্তিবলে নহে, ব্রাহ্মণের রাজনৈতিকশক্তিবলে নহে, ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতাপ্রসূত আইনকানুনবলে নহে। সে কেবল ব্রাহ্মণের উচ্চতম অনুশীলনবলে, উচ্চধর্ম্মচর্য্যাবলে, আজীবনব্যাপী কঠোর তপস্যাবলে। সেই অনুশীলন, সেই ধর্ম্মচর্য্যা, সেই কঠোর তপস্যারূপ অগ্নিসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া, একজন কামক্রোধলোভাদি রিপুপরায়ণ ক্ষত্রিয়নরপতি জ্বলন্ত উৎসাহ, দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা, অদম্য অধ্যবসায়কে আশ্রয় করিয়া কি প্রকারে শমদমাদিগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণত্বলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ইহাই এই আখ্যায়িকায় আমরা বিশেষরূপে দেখিতেছি।

চরিত্রবিশ্লেষণ

বিশ্বামিত্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তিনি প্রথমতঃ একজন বলদৃপ্ত, লোভপরায়ণ, পরশ্রীকাতর ক্ষত্রিয় নরপতি। তাঁহার মধ্যে রজোগুণ পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান। বসিষ্ঠাশ্রমে তিনি অতিথি, মহর্ষি বসিষ্ঠ পরমপ্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। তাঁহার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বসিষ্ঠের কামধেনুটি দেখিয়া বিশ্বামিত্রের দুর্জ্জয় লোভ জন্মিল। ঋষি তাঁহাকে সে কামধেনু প্রদান করিলেন না, সেজন্য তাঁহার দারুণ অভিমান ও ক্রোধের উদয় হইল। ক্রোধের পরই বলপ্রয়োগস্পৃহা এবং যুদ্ধ। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার অভিমান দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। যুদ্ধ ত ক্ষত্রিয়েরই ধর্ম্ম—ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কেবল যাগযজ্ঞতপস্যা। সেই ব্রাহ্মণের হস্তে বিশ্বামিত্র পরাস্ত হইলেন, ব্রহ্মতেজে তাঁহার

ক্ষত্রিয়তেজ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। ইহা অপেক্ষা অপমানের বিষয় আর কি হইতে পারে? তাই বিশ্বামিত্র শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সে কি জন্য? নিজের হিতাকাঙ্ক্ষায় নহে, সে কেবল পরপীড়নের জন্য, শত্রুদমনের জন্য, বসিষ্ঠকে জব্দ করিবার জন্য। বিশ্বামিত্রের চিত্তে জিঘাংসাপ্রবৃত্তি বড়ই প্রবল, তিনি তখনও রজোগুণপ্রধান ক্ষত্রিয়। তপস্যার ফলে তিনি শিবের নিকট বরলাভ করিয়া মনে করিলেন—"এবার আর আমাকে পায় কে? আমি এখনই বসিষ্ঠকে সবংশে নিধন করিব।" কিন্তু তাঁহার সকল দর্প চূর্ণ হইল—বসিষ্ঠের ব্রহ্মতেজে তাঁহার ক্ষাত্রতেজ নির্ব্বাপিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তিনি যত-বড় রাজাই হউন, ব্রাহ্মণের নিকট তাঁহার বাড়াবাড়ি খাটিবে না। ব্রাহ্মণ না হইতে পারিলে ব্রাহ্মণের নিকট জয়ের আশা নাই। তাই তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার জীবননাটকের এক নূতন অঙ্ক উদ্ঘাটিত হইল। তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার চিত্ত তমঃ ও রজোগুণনির্ম্মুক্ত হইয়া যতই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবাপন্ন হইতে লাগিল, তিনি ততই এক একটি উচ্চস্তরে উঠিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা প্রথমে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়া দেখেন, তিনি আর সেই ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র নাই, তিনি তপস্যার ফলে হইয়াছেন 'রাজর্ষি'—অর্থাৎ অর্দ্ধেক রাজা, অর্দ্ধেক ঋষি। কিন্তু বিশ্বামিত্র তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন, তাই আবার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তপঃপ্রভাবে আরও উচ্চে উঠিতে লাগিলেন। এই সময়ে সেই ত্রিশঙ্কুর ব্যাপার সঙ্ঘটিত

হইল। ইহাও বিশ্বামিত্রের একটি বিশেষ পরীক্ষা। সেই ত্রিভুবনবিস্ময়কারী ঘটনায় আমরা দেখিতে পাই, বিশ্বামিত্র তপস্যায় বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহাকে একজন ঋষি বলিয়া গণ্য করিতেছেন। এমন কি, সকলেই তাঁহার তপোভয়ে ভীত। তাঁহার তপঃপ্রভাবে ত্রিশঙ্কু স্বর্গলোক পর্য্যন্ত উঠিতে পারিলেন। এমন কি, তপোবলে তিনি আর একটি স্বর্গ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তপস্যার দুর্দ্দমনীয় তেজে সুরাসুরগণ কম্পিত হইয়া আসিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। কিন্তু তপস্যায় এতদূর অগ্রসর হইলেও বিশ্বামিত্রের মধ্যে তখনও রজোগুণ রহিয়াছে। তখনও তিনি ক্রোধ, জিগীষা, জিঘাংসার বশীভূত, তখনও তিনি ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই। সেজন্য তিনি আবার তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এবার অম্বরীষ রাজার পালা। ইহাও বিশ্বামিত্রের পরীক্ষার জন্য। এবার তপঃ-প্রভাবে তাঁহার চিত্ত আরও প্রশস্ত ও প্রশান্ত হইয়াছে। তিনি একটি গরুর লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া বসিষ্ঠের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবার তিনি শিশু শুনঃশেফের প্রাণ-রক্ষার্থ নিজের পুত্রদিগকে অম্বরীষ রাজার যজ্ঞে জীবনাহুতি দিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার এতদূর চিত্তোন্নতি দেখিয়া ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"বিশ্বামিত্র, তুমি ঋষি হইয়াছ।"

কিন্তু ঋষি হইয়াও তিনি সন্তুষ্ট নহেন, তাই আবার ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। আবার তাঁহার পরীক্ষা হইল।

এবারকার পরীক্ষায় তিনি পরাস্ত হইলেন। মেনকার রূপের মোহে তিনি মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। এইরূপ ক্ষণস্থায়ী চিত্তবিভ্রংশ অনেকেরই ঘটিতে পারে। তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত তপোবল আবার জাগিয়া উঠিল। কামরিপুর পরাভব ঘটিল। তখন অনুতাপের বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া তাঁহার চিত্ত আবার নির্ম্মলভাব ধারণ করিল। এবার ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে আর এক-গ্রেড্ উপরে প্রোমোশন্ দিলেন। এবার তিনি 'মহর্ষি' হইলেন। তিনি এখন লোভকে জয় করিয়াছেন, কামকে জয় করিয়াছেন, কিন্তু তবুও তিনি ব্রাহ্মণ হইতে পারিলেন না। তাই তিনি আবার অধিকতর কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আবার পরীক্ষা হইল। ইন্দ্র তাঁহার তপোভঙ্গের জন্য রম্ভাকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রম্ভা তাঁহাকে রূপের মোহে মজাইতে পারিল না—সে নিজে মজিল। তাহাকে অভিশপ্ত করিয়া বিশ্বামিত্রও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন না। তিনি লোভজয় করিয়াছেন, কামজয় করিয়াছেন, কিন্তু এখনও ক্রোধজয় করিতে পারেন নাই। তিনি অনুতপ্ত হইলেন, তিনি আবার তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অনেকদিন পরে ইন্দ্র তাঁহার পরীক্ষার জন্য ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া আসিয়া ক্ষুধার সময় তাঁহার মুখের অন্ন কাড়িয়া লইলেন। বিশ্বামিত্র কিন্তু এবার ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি এতদিনে ক্রোধকেও জয় করিয়াছেন। তাঁহার উগ্র তপস্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদ্বেজিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এখন তিনি তপঃসিদ্ধ। এখন তাঁহার মধ্যে পাপের লেশমাত্রও নাই। এখন

তাঁহার চিত্ত রজোগুণবিমুক্ত হইয়াছে—এখন দয়া, ক্ষমা, জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সত্ত্বগুণ তাঁহার হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়াছে। তাই ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে "ব্রহ্মর্ষি" বলিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন। বিশ্বামিত্র কৃতার্থ হইলেন।

এইরূপে বিশ্বামিত্রচরিত্রের বিশ্লেষণদ্বারা আমরা দেখিতেছি, একজন কামক্রোধলোভাদি-রিপুপরায়ণ ক্ষত্রিয় নরপতি কিপ্রকার সাধনবলে সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরা আরও পাইতেছি, আর্য্যজাতির শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য ও মহত্ত্ব কতদূর গৌরবান্বিত, কত-কঠোর-সাধনা-সাপেক্ষ। এবং ব্রাহ্মণগণ তপস্যাদ্বারা এই ভারতভূমিতে যে আর্য্য সভ্যতা প্রবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার আদর্শ কত উচ্চ! যে ব্রাহ্মণের গৌরবান্বিত পদ একদিন রাজর্ষি, ঋষি, মহর্ষি পদ অপেক্ষাও শ্লাঘনীয় ছিল, আজ সেই ব্রাহ্মণবংশের কি শোচনীয় দুর্গতি!

দৈব ও পুরুষকার

এই বিশ্বামিত্রোপাখ্যানে আমরা আরও একটি তত্ত্বের মীমাংসা পাইতেছি। আমাদের অনেকের বিশ্বাস, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পুরুষ-কার অপেক্ষা দৈববল শ্রেষ্ঠ, আমাদের অদৃষ্টের শাসন অকাট্য। কিন্তু এখানে আমরা তাহার অন্যবিধ মীমাংসা পাইতেছি। ত্রিশঙ্কু, বসিষ্ঠ এবং তাঁহার পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইয়া বলিতেছেন—

"হে মুনিবর! আমি যথাবিধি ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করিয়াছি, শতশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সদাচার ও সদ্‌গুণ দ্বারা গুরু-জনের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছি, কিন্তু কৈ, কেহই ত আমার প্রতি সদয় হইলেন না। অতএব আমার স্থির বিশ্বাস, পৌরুষ নিরর্থক, দৈবই শ্রেষ্ঠ। এইরূপে দৈবকর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইয়া আমি আপনার শরণাপন্ন হইতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। পুরুষকারদ্বারা দৈবকে নিবর্ত্তিত করুন—

"দৈবং পুরুষকারেণ নিবর্ত্তয়িতুমর্হসি।"

পুরুষকারের সাক্ষাৎ জ্বলন্তমূর্ত্তি মহাত্মা বিশ্বামিত্র স্বীয় পুরুষ-কারপ্রভাবে দৈবের নিয়তিবন্ধন ছিন্ন ও দেবগণকে পরাস্ত করিয়া কি প্রকারে ত্রিশঙ্কুর মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। পুরুষকারদ্বারা কিপ্রকারে দৈবকে অতিক্রম করা যায়, বিশ্বামিত্র তাঁহার নিজজীবনের কার্য্যকলাপদ্বারাও তাহা বিশেষরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং দৈববল অনতি-ক্রমণীয়, পুরুষকার দৈবশক্তির নিকট পরাভূত, এ কথা হিন্দু-শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় নহে। আমাদের পূর্ব্বতন আর্য্যপুরুষগণ যেরূপ কঠোর তপস্যাদ্বারা দৈববলকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ অভীষ্টপথে সিদ্ধিলাভ করিতেন, পুরাণেতিহাসে তাহার বহু উদাহরণ বিদ্যমান।*

---

* তপস্যার বরদাতা অবশ্য ঈশ্বর, সুতরাং পুরুষকার ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পুরুষকারের দ্বারা যে দৈববল পরাভ করা যায় তাহাও ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন ঘটনা।

তপস্যা

তপস্যা যে কেবল ব্রহ্মত্বলাভের উপায় তাহা নহে; তপস্যা যে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টসিদ্ধির প্রকৃষ্ট পন্থা, ইহা তাঁহারা সম্যক্ রূপে বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা যখন যাহা লাভ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইতেন, তখন তাহা লাভের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া, অন্যের নিকট ভিক্ষা করিতে না গিয়া, পুরুষকার অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতেন। তাই আমরা দেখিতে পাই—হিরণ্যকশিপু অমরবরলাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন, ধ্রুব পিতার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠপদলাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন, ভগীরথ গঙ্গা আনয়নের জন্য তপস্যা করিতেছেন, হৈমবতী উমা পতিলাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন, অর্জ্জুন পাশুপতাস্ত্রলাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন, সুরথ রাজা তাঁহার ভ্রষ্টরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য তপস্যা করিতেছেন, সমাধিবৈশ্য নির্ব্বাণমোক্ষলাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন, মহারাজ অশ্বপতি একটি অলোকসামান্যা-সন্ততি লাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন। পুরাণেতিহাসে এরূপ আরও শত শত দৃষ্টান্ত আছে। বস্তুতঃ বসিষ্ঠধেনু শবলার ন্যায় তপ যে সর্ব্বকামপ্রদ, ইহা পূর্ব্বতন আর্য্যগণ বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন। অথবা সেই কামধেনুই শরীরিণী তপস্যা। তাই বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বলিতেছেন—

"শাশ্বতী শবলা মহ্যং কীর্ত্তিরাত্মবতো যথা।
অস্যাং হব্যঞ্চ কব্যঞ্চ প্রাণযাত্রা তথৈব চ॥

আয়ত্তমগ্নিহোত্রঞ্চ বলিহোমস্তথৈব চ।
স্বাহাকারবষট্‌কারৌ বিদ্যাশ্চ বিবিধাস্তথা॥
আয়ত্তমত্র রাজর্ষে সর্ব্বমেতন্ন সংশয়ঃ।
সর্ব্বস্বমেতৎ সত্যেন মম তুষ্টিকরী তথা॥”

অর্থাৎ আত্মবান্ ব্যক্তির কীর্ত্তির ন্যায় শবলা আমার চির-সহচরী; আমার হব্যকব্য, জীবনযাত্রা, অগ্নিহোত্র, বলি, হোম, স্বাহাকার, বষট্‌কার ও বিবিধ বিদ্যা এসমস্তই ইহার আয়ত্ত।

বসিষ্ঠের এই শরীরিণী তপস্যা কামধেনু যেমন ক্ষুধায় প্রচুর-পরিমাণে অন্নপ্রদান করিতে পারে, তেমন শত্রুবিনাশের জন্য অপ্রতিহত শৌর্য্যবীর্য্য ও অগণন সৈন্যসম্পদ্ প্রদান করিতে পারে, আবার দুর্জ্জয়-ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-প্রশমনের দ্বারা সাধককে ব্রহ্মত্বে পর্য্যন্ত উন্নয়ন করিতে পারে। তপস্যা কামধেনুর ন্যায় সর্ব্ব-কামদা—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বিধ ফল প্রদান করিতে সমর্থা। তাই ভগবান্ মনু বলেন—

“তপোমূলমিদং সর্ব্বং দৈবমানুষকং সুখম্।
তপোমধ্যং বুধৈঃ প্রোক্তং তপোঽন্তং বেদদর্শিভিঃ॥
ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥
ঋষয়ঃ সংযতাত্মানঃ ফলমূলানিলাশনাঃ।
তপসৈব প্রপশ্যন্তি ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥

ঔষধাম্মগদো বিদ্যা দৈবী চ বিবিধা স্থিতিঃ।
তপসৈব প্রসিধ্যন্তি তপস্তেষাং হি সাধনম্॥
যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্॥"

মনুসংহিতা, ১১শ অধ্যায়, ২৩৫—২৩৯

ইহার ভাবার্থ এই—দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে যতপ্রকার সুখ আছে, তপস্যাই সে সকলের আদি, তপস্যাই তাহাদের স্থিতি, তপস্যাই তাহাদের শেষ। ব্রাহ্মণের তপস্যা জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের তপস্যা প্রজারক্ষণ (যুদ্ধাদি), বৈশ্যের তপস্যা কৃষিবাণিজ্যাদি, শূদ্রের তপস্যা সেবা ;—অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নিজ নিজ বর্ণধর্ম্ম পালন করিতে হইলে তপস্যার প্রয়োজন। সেইরূপ সংসারত্যাগী ঋষিগণ আত্মসংযম এবং ফলমূলবায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক যে উৎকট তপস্যা করেন, তদ্দ্বারাই তাঁহারা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নখ-দর্পণের ন্যায় দর্শন করিতে পারেন। ঔষধবল, বিদ্যাবল, নীরোগিতা এবং বিবিধ স্বর্গাদিতে স্থিতি, অর্থাৎ স্বাস্থ্যজন্য সুখ, বিদ্যাজন্য সুখ এবং স্বর্গাদিপ্রাপ্তিজন্য সুখ, এই সর্ব্বপ্রকার সুখের একমাত্র তপস্যাই সাধন। যাহা-কিছু দুস্তর, যাহা-কিছু দুর্লভ, যাহা-কিছু দুর্গম, যাহা-কিছু দুষ্কর, তৎসমস্তই তপোবলে সাধন করা যায়—তপস্যার শক্তিকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।

বিশ্বামিত্র এই তপোবলকে আশ্রয় করিয়া একটি নূতন

স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ মনু বলেন, লোকপিতামহ ব্রহ্মাও তপস্যাকে আশ্রয় করিয়া এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন! যে তপস্যার বলে বিশ্বামিত্রের ন্যায় মানব স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার স্থান অধিকার করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, সে তপস্যার বল ত সামান্য নহে। সে তপস্যার বল কোথা হইতে আসে? সে তপস্যা কি? বিশ্বামিত্রের তপস্যা কি?

তপস্যার অর্থ সাধনবলে আত্মশক্তির বিকাশ। আমাদের মানবাত্মায় অতি উচ্চতম শক্তিসকল নিহিত রহিয়াছে। কেন না, মানবাত্মা ত আর কিছু নহে, মানবাত্মাই ঈশ্বরাত্মা—আত্মাই ব্রহ্ম। আমার আত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু। যে কামক্রোধাদি রিপুগণের উত্তেজনায় আমি আমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, যে মায়ামোহের আবরণে আমি আমার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া রহিয়াছি, যদি একবার সাধনাদ্বারা সেই সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে সংযত করিতে পারি, যদি একবার কঠোর আত্মসংযম দ্বারা সেই মায়ামোহের আবরণ অপসারিত করিতে পারি, তবে আমার আত্মার শক্তিসকল পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিবে, তখন মেঘনির্ম্মুক্ত ভাস্করের ন্যায় আমার আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপে জাগিয়া উঠিবে। তাই বসিষ্ঠের নিকট পরাস্ত হইয়া বিশ্বামিত্র প্রতিজ্ঞা করিলেন—"ইন্দ্রিয়মনকে সংযত করিয়া আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইব, কারণ তপস্যাই ব্রহ্মত্বলাভের কারণ।" বিশ্বামিত্র কি সাধনপ্রণালী অবলম্বনে কামক্রোধলোভমোহাদি রিপুদিগকে দমন করিয়া তাঁহার আত্মায় গূঢ়ভাবে নিহিত বিবেক-বৈরাগ্য-জ্ঞান,

শম-দম-তিতিক্ষাদি গুণ বিকশিত করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু তপঃসাধনের জন্য সংসারত্যাগপূর্ব্বক বনগমন যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বোধ হয় না। ভগবান্ মনু বলেন—"ব্রাহ্মণের জ্ঞানোপার্জ্জন তপস্যা, ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষণ তপস্যা, বৈশ্যের কৃষিবাণিজ্যাদি তপস্যা, শূদ্রের সেবাবৃত্তি তপস্যা।" ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি সেই পথে থাকিয়াও তপস্যা করিতে পারেন। তপঃসাধনকে গীতায় তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা—শারীর তপ, বাঙ্ময় তপ এবং মানস তপ।

"দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জনম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥"

১৭শ অধ্যায়, ১৪—১৬।

'দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু এবং সাধুব্যক্তির পূজা, শৌচাচার, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য এবং অহিংসা, ইহাকে শারীর তপ বলে। অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় এবং হিতবাক্য কথন, এবং বেদাধ্যয়ন করাকে বাঙ্ময় তপ বলে। মনের প্রসন্নতা, সৌম্যতা (সর্ব্বলোক-

হিতৈষিতা), মৌন (নিষিদ্ধ বিষয় চিন্তা না করা), আত্মবিনিগ্রহ, ভাবশুদ্ধি, ইহাকে মানস তপ বলে।'

এই গীতোক্ত তপঃসাধন গার্হস্থ্যাশ্রমের সম্পূর্ণ উপযোগী। ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, দেবদ্বিজগুরুভক্তি, শাস্ত্রাভ্যাস, চিত্তশুদ্ধি, আত্মনিগ্রহ—এই সকল সাধনই তপস্যা। এই সকল সাধনদ্বারা আত্মার অতি উচ্চতম শক্তিসকলের স্ফূরণ হইয়া থাকে, এবং ক্রমশঃ মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ হয়। তবে যে সকল পূর্ব্বতন মনীষী কেবল মনুষ্যত্বলাভে সন্তুষ্ট না হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের জন্য ব্যাকুল হইতেন, তাঁহারা সহস্রবাধাবিঘ্নসঙ্কুল সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যা করিতেন। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা যেমন অতি উচ্চ ছিল, তেমনি তাঁহাদের আত্মশক্তির উপর নির্ভরও খুব বেশী ছিল। তাঁহারা আত্মজ্ঞানলাভের জন্য কোন দেবতার উপাসনা করিতেন না, "তুমি আমাকে ত্রাণ কর" বলিয়া কোন দেবতার কৃপাকটাক্ষ-লাভের জন্য তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইতেন না। সে যুগের সাধনা ছিল জোরজবরদস্তীমূলক। "তুমি দেবতা, আমাকে অভীষ্টবর প্রদান করিবে না? আচ্ছা দেখিব আমি, তুমি কোথাকার কেমন দেবতা। আমি এই তপস্যায় বসিলাম।" তাঁহারা ঘোরতর কঠোরতা অবলম্বন করিতে পারিতেন, তাই তাঁহাদের সাধনার এতদূর জোরজবরদস্তী ছিল। তাঁহাদের এইরূপ দুর্দ্দমনীয় আত্মবল ছিল বলিয়াই তাঁহাদের তপস্যায় ইন্দ্র ভীত হইতেন, ধরাতল কম্পিত হইত, ব্রহ্মা স্বয়ং বরপ্রদানের জন্য

ভূতলে অবতীর্ণ হইতেন। এইরূপে তাঁহারা তপোবনে আত্মবিজয়ী হইয়া পরে বিশ্ববিজয়ী হইয়াছিলেন। এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল—কিন্তু তাহা পাশববলের দ্বারা নহে,—maxim gun কিংবা torpedo boatএর দ্বারা নহে, তাহা তাঁহাদের তপোলব্ধ বিশ্বগ্রাসী হৃদয়ের প্রীতিপ্রবাহদ্বারা। তাঁহারা তপঃসাধনাদ্বারা "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" (আত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে, এবং সর্ব্বভূতকে আত্মার মধ্যে) দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের তপস্যার ফলে একদিন ভারতবর্ষে যে অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ্যসভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল, তাহার মূলমন্ত্র হইতেছে— "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা।" যে "সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা"র দোহাই দিয়া একদিন ফরাসীজাতি নরশোণিতে ধরাতল প্লাবিত করিয়াছিল, আমি সে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কথা বলিতেছি না। যে সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একদিন দৈত্যকুমার প্রহ্লাদ দৈত্যশিশুদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

"সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ! সমতামুপেত
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য।"

'হে দৈত্যশিশুগণ, তোমরা সাম্য অবলম্বন কর—সাম্যই বিষ্ণুর প্রকৃত আরাধনা',—আমি সেই সাম্যের কথা কহিতেছি। দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে রাজনীতি শিক্ষা করিবার জন্য গুরুগৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে

বাস করিয়া প্রত্যাগত হইলে, হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মিত্রেষু বর্ত্তেত কথমরিবর্গেষু ভূপতিঃ ?"

'রাজা মিত্রের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন, আর শত্রুর সঙ্গেই বা কিরূপ ব্যবহার করিবেন ?'

তদুত্তরে দৈত্যকুমার বলিলেন—

"সর্ব্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্রকথা কুতঃ ॥
ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ।
যতস্ততোঽয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ ॥"

'হে পিতঃ, জগন্নাথ জগন্ময় পরমাত্মা গোবিন্দ যখন সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন, তখন মিত্র আর শত্রু, এরূপ কথা কেন ? ভগবান্ বিষ্ণু তোমাতে আছেন, আমাতে আছেন, অন্যত্রও আছেন। সুতরাং ইনি মিত্র, উনি শত্রু, এরূপ ভেদজ্ঞান থাকিবে কেন ?'

যে সাম্য জগন্ময়ের জগতে শত্রুমিত্রের ভেদ দেখিতে পায় না, তাহাই প্রকৃত সাম্য। ফরাসীজাতি যে সাম্যের সাধন করিয়াছিলেন, তাহা অহঙ্কারমূলক—তাহার মূলমন্ত্র হইতেছে, "তুমি যে মানুষ, আমিও সে-ই মানুষ ; তোমার যে অধিকার আছে, আমারও সেই অধিকার থাকা উচিত।" আর এই ঋষিগণের তপস্যালব্ধ সাম্য অহঙ্কারবিনাশের ফল ; "তুমি আমি সকলেই

সচ্চিদানন্দময়, তোমা হইতে আমার কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই"—এইরূপ ধারণামূলক। এইপ্রকার সাম্যসাধনা দ্বারাই মৈত্রীর রাজ্য, প্রীতির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন সর্ব্বত্র সকলেই স্বাধীনতালাভ করে, কেহ কাহাকে অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারে না। তখন সকলেই সকলকে এক বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে দর্শন করে। এইরূপে সাম্য হইতে মৈত্রীর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, মৈত্রী হইতে স্বাধীনতার বিকাশ হয়। আজ maxim gun ও torpedo boatএর যুগে যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা কবির স্বপ্নরাজ্যের কল্পনা এবং William Stead, Count Tolstoy প্রমুখ লোকহিতব্রত মহাত্মাদিগের হৃদয়ের শুভ আশা ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু, একদিন ব্রাহ্মণগণের তপোবলে ভারতবর্ষে সেই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাস্তববিকাশ (realisation) হইয়াছিল। বিশ্বামিত্রের হৃদয়ে সমগ্র বিশ্ব—স্থাবরজঙ্গম-কীটপতঙ্গ-পশুপক্ষি-মনুষ্যাদি-সংবলিত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড—এক পবিত্র প্রীতির দিব্যদ্যুতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তাই আদর্শব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্রের বিশ্বব্যাপি-হৃদয়ে শব্দব্রহ্মের স্ফুরন্ত তেজ—ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার মূলমন্ত্র সাবিত্রীমন্ত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা।

সেই মহামহিমমণ্ডিত মহাত্মাদিগের বংশধরগণ আমরা—আজ আমাদের সে তপোবল নাই, সে তেজোবীর্য্য নাই, সে জ্ঞানৈশ্বর্য্য নাই—আমরা এখন অধঃপতিত, ধূলিলুণ্ঠিত। যে সাধনবলে তাঁহারা

মনুষ্যত্ব হইতে ঋষিত্বে, ঋষিত্ব হইতে দেবত্বে উন্নীত হইয়াছিলেন, আমরা তাঁহাদের সে সাধনা ভুলিয়া গিয়াছি। দেবত্ব, ঋষিত্ব, ব্রাহ্মণত্ব ত অতি দূরের কথা, আমরা এখন মনুষ্যত্ব হারাইয়া বসিয়াছি। তাই আজ সেই মনীষিগণের সাধনসম্পদের অধিকারী হইয়াও আমরা সামান্য পার্থিব সুখসুবিধার জন্য পরমুখাপেক্ষী, অন্যের কৃপাভিখারী। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বরং ত্রিশঙ্কুর সহিত আমাদিগকে তুলনা করা যাইতে পারে। ত্রিশঙ্কু যেমন নিজে তপোবলহীন হইয়াও কেবল পরের সাহায্যে সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, আমরাও সেইরূপ নিজ নিজ ব্যক্তিগত জীবনে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের চেষ্টা না করিয়া কেবল কংগ্রেস্ কন্ফারেন্স প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ে জাতীয় উন্নতি লাভের চেষ্টা করিতেছি।

দেশের শিক্ষিত জনমণ্ডলীর মাতৃভূমির হিতকামনায় এই সকল আন্তরিক উদ্যমকে আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি। শ্রদ্ধা করি বলিয়াই এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কোন্ শিক্ষিত ভারতসন্তানের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা নয় যে, ভারতবাসিগণের আবার জাতীয় অভ্যুদয় হউক, আবার ভারত প্রবুদ্ধ হউক? কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমাদের এই জাতীয়জীবনের মুমূর্ষু দশায় তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করা হইতেছে, তদ্দ্বারা তাহাকে বাঁচাইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। যে বিকারগ্রস্ত রোগীর নাড়ী দমিয়া যাইতেছে,—pulse sink করিতেছে,—তাহাকে জীবিত রাখিবার জন্য যদি তাড়িতযন্ত্র

(battery) লাগান হয়, তবে যে অঙ্গে সেই তড়িৎপ্রবাহ সংযোজিত হইবে, কেবল সেই অঙ্গই ক্ষণকালের জন্য নড়িয়া উঠিবে, তাহাতে রোগী জীবনীশক্তি লাভ করিয়া আবার দাঁড়াইয়া উঠিবে না। মৃত ভেকের পায়ে তড়িৎপ্রবাহ স্ফুরিত হওয়াতে, সেই পা'টা কেবল ক্ষণকারের জন্য নাচিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সে ভেক ত আর বাঁচে নাই। আমাদের জাতীয়জীবনের পুনর্গঠন করিতে হইলে, প্রথমে দেখিতে হইবে, তাহার pulse কোন্‌খানে ; পরে সেই pulse ধরিয়া, রোগীর ধাতুর অনুকূলে উপযুক্ত চিকিৎসা করিতে হইবে—সেই pulse যাহাতে rise করে—আবার যাহাতে ধাত আসে—সেজন্য আবশ্যক হইলে উত্তেজক ঔষধ (stimulant) দিতে হইবে।

এই বিশাল ভারতবর্ষে আমরা হিন্দু-মুসলমান-শিখ্-পারসী প্রভৃতি নানাজাতি বাস করিতেছি—আমরা সকলেই একদেশবাসী এবং এক প্রকারের শাসনাধীনে থাকিয়া পরস্পরের সুখদুঃখভাগী। ইহাই আমাদের মধ্যে একটি জাতীয়তাবন্ধনের প্রকৃষ্ট সূত্র, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থায় এই সূত্রে জাতীয়তাবন্ধনের কোন সম্ভাবনা দেখি না। ইংরেজশাসনের দোষপ্রদর্শন করিবার জন্য ভিন্নজাতীয় এবং ভিন্নদেশীয় লোকমণ্ডলী সমবেত হইলেই যে তাহাদের মধ্য হইতে একটা জাতীয়তা জমাট বাঁধিয়া উঠিবে, এরূপ আশা করা বৃথা। আমরা কেবল শাসনকর্ত্তৃগণের দোষপর্য্যালোচনাদ্বারাই আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মের পর্য্যবসান হইল মনে করি,—জাতীয়তাসৃষ্টির জন্য আমাদের যে সকল

গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা অর্জ্জন ও অনুশীলন করিবার চেষ্টা করি কই ? যাহাদের মধ্যে ভাইয়ে-ভাইয়ে একতা নাই, স্বগ্রামবাসিগণের মধ্যে একতা নাই, সজাতীয় লোকের মধ্যে একতা নাই—যাহাদের মধ্যে গ্রাম্যস্কুল লইয়া দলাদলি, সহরের মিউনিসিপ্যালিটি লইয়া দলাদলি, ডাক্তারখানা লইয়া দলাদলি, সাহিত্যসমিতি লইয়া দলাদলি—যাহারা সুশিক্ষিত হইয়াও বারোয়ারির আমোদপ্রমোদের জন্য সহস্র সহস্র টাকা উড়াইয়া দিতেছে, অথচ সাধারণহিতকল্পে প্রতিষ্ঠিত স্কুল কিংবা ডাক্তারখানার চাঁদা স্বাক্ষর করিয়া দিতে অনিচ্ছুক—এইপ্রকার লোকমণ্ডলীর মধ্যে শুদ্ধ এক বিশালদেশবাসী ও এক ইংরেজ সম্রাটের শাসনাধীনে থাকিয়া একপ্রকার সুখভোগী এবং একপ্রকার দুঃখভোগী বলিয়া কি কখনও একতাবন্ধন হইতে পারে, না জাতীয়তার গঠন হইতে পারে ?

বস্তুতঃ আমাদের হিন্দুজাতির মধ্যে কখনও স্বদেশপ্রীতিমূলক জাতীয়তাবন্ধন ঘটে নাই। "আমরা একজাতি"—"আমাদের এক দেশ" বলিয়া সর্ব্বজনীন জাতীয়ভাব কখনও হিন্দুজাতির মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং এইরূপ জাতীয়তাসৃষ্টির পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে যাহাতে ব্যক্তিগত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত মনুষ্যত্ব গঠিত হইলে, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক শ্রীবৃদ্ধি এবং জাতীয় উৎকর্ষ আবশ্যম্ভাবী। সাধুতা (honesty), ঐকান্তিকতা (sincerity), কর্ত্তব্যনিষ্ঠা (devotion to duty), সৎসাহস (moral courage), একতা

(unity), স্বার্থত্যাগ (selfsacrifice) ইত্যাদি মনুষ্যোচিত গুণগ্রাম আমাদের মধ্যে বর্দ্ধিত হইলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাশক্তি জমাট বাধিবে। কিন্তু এই সকল গুণ লাভ করিতে হইলে সাধনা চাই, তপস্যা চাই। মহর্ষি বিশ্বামিত্র যে কঠোর সাধনাবলে তাঁহার আত্মার অন্তস্তলে লুক্কায়িত উচ্চতম শক্তিসকলের বিকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আমাদিগকেও সেইরূপ কঠোর সাধনা, কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র আমাদের বর্ত্তমান যুগের আদর্শ;— তাঁহার অদম্য অধ্যবসায়, দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা এবং কঠোর আত্মসংযমই আমাদের উদ্ধারের একমাত্র উপায়। তাঁহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া আজ আমাদিগকে আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পরমোদার বিশ্বপ্রীতির আদর্শে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গত, জাতিগত, ধর্ম্মগত ভেদ ভুলিয়া গিয়া এই হিন্দুস্থানের হিন্দু-মুসলমান, শিখ-খ্রীষ্টান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জাতি মিলিয়া এক অভিনব বিশাল মহাজাতি গঠন করিতে হইবে। এইরূপে তপস্যা-দ্বারা আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং জাতীয়তাশক্তির স্ফুরণ হইলে—লোকপিতামহ ব্রহ্মা যেমন একদিন বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ্যপদবীতে বরণ করিবার জন্য স্বয়ং অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, গুণগ্রাহী ইংরেজজাতিও তদ্রূপ আমাদিগকে সসম্ভ্রমে উচ্চতম রাজনৈতিক স্বাধীনতার মাল্যচন্দন পরাইবার জন্য অগ্রসর হইবেন—তখন আর আমাদিগকে বিলাত পর্য্যন্ত গিয়া ভিক্ষুকের

ন্যায় ইংরেজের দ্বারে দ্বারে ভারতের দুঃখকাহিনী কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে হইবে না।*

জাতীয় জীবনের নাড়ী কোথায় ?

বঙ্গের মুখশ্রী যাঁহা হইতে উজ্জ্বল হইয়াছে, সেই মহাকবি দীপকরাগে গাইয়াছেন—

"ছিল বটে আগে তপস্যার বলে
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্তরণস্থলে
সংগ্রাম করিত অমরগণ।
"এখন সেদিন না হবে রে আর
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার
হবে না হবে না * * *
এ সব দৈত্য নহে তেমন ॥"

ত্রয়োদশবৎসর পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল। বড়ই সুখের বিষয়, এই কয়েক বৎসরে আমাদের জাতীয় চরিত্রের অনেক উন্নতি হইয়াছে। এখন বাঙ্গালীজাতির মধ্যে সৎসাহস, স্বার্থত্যাগ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীপলটন গঠন ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাহার ফলে, ঐ দেখ সদাশয় ভারতসচিব মণ্টেগু ভারতবাসীকে রাজনৈতিক অধিকারের মাল্যচন্দন পরাইবার জন্য ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছেন।

যদি বক্তৃতার উচ্ছ্বাসে কিংবা কবিত্বের উদ্দীপনায় ভারত উদ্ধার হইত, তবে দেশে এত বাগ্মী ও বক্তা থাকিতে আমাদের এ দুর্দ্দশা কেন? আমরা কতকাল ধরিয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার বীরগণের ঐতিহাসিক কাহিনী আলোচনা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু তাহাতে আমাদের মনে বীরত্ব জাগিয়া উঠে না কেন? ভারত-উদ্ধার এখন কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিয়া আমার বিবেচনায় আমাদিগকে একবার আত্ম-উদ্ধারে মনোনিবেশ করিতে হইবে। পরম সৌভাগ্যের বিষয়, পূর্ব্বতন আর্য্যগণের তপস্যার ফলে এখনও আমাদের মধ্যে সেই আত্ম-উদ্ধারের বীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সেই আত্ম-উদ্ধারের বীজ কোথায়? হিন্দুজাতির ধর্ম্মপ্রবণ চিত্তে। ধর্ম্মের উৎকর্ষদ্বারাই একদিন আমাদের ব্যক্তিগত মনুষ্যত্ব, সামাজিক একতা এবং জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি সংঘটিত হইয়াছিল, আবার সেই ধর্ম্মের অপকর্ষদ্বারাই আমাদের সর্ব্বপ্রকার অধঃপতন ঘটিয়াছে। ধর্ম্মই হিন্দুর জীবনবায়ু, ধর্ম্মই হিন্দুর জাতীয়জীবনের pulse (নাড়ী)। তাই এই নিদারুণ অধঃপাতের দিনেও এক ধর্ম্মের নামে সমগ্র হিন্দুজাতির হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে একমাত্র ধর্ম্মের নামে প্রত্যেক হিন্দুর ধমনীতে ধমনীতে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিয়া থাকে, একমাত্র ধর্ম্মচুম্বকের আকর্ষণবলে সমাজের বহুধাবিচ্ছিন্ন চির-মরিচা-পড়া লৌহকণাগুলি ছুটিয়া আসিয়া পুঞ্জীকৃত হয়। এই জীবন্ত ধর্ম্মবিশ্বাসের বলে এখনও সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী একমাস-দুইমাসের পথ হাঁটিয়া অনাহারে অনিদ্রায় দুর্গম তীর্থ-

সকল দর্শনের জন্য ছুটিয়া যায় এবং পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত ও কঠোর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বহ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় অম্লানচিত্তে প্রাণবিসর্জ্জন দেয়। এক ধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন্ বস্তুর জন্য হিন্দুজাতি এ ভাবে জীবন দিতে প্রস্তুত? হিন্দুজাতি কোন্ মহাপুরুষকে সমাজের নেতা বলিয়া স্বীকার করিবে? তাঁহাকে নহে,—যিনি মর্ম্মস্পর্শিনী জ্বালাময়ী ভাষায় স্বদেশহিতৈষণা-সমুদ্দীপক বক্তৃতা করিতে পারেন। তাঁহাকে নহে,—যিনি অগাধজ্ঞান, প্রখরবুদ্ধি ও সর্ব্বদর্শিভূয়োদর্শনবলে কূটরাজনৈতিক সমস্যাসকলের মীমাংসা করিতে পারেন। তাঁহাকে নহে,—যিনি শাণিত-কৃপাণ-করে অগণন-শত্রুদল-মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে জীবনবিসর্জ্জন দিতে পারেন। আজ যদি যুক্তরাজ্যের স্বাধীনতা-প্রবর্ত্তক মহাবীর ওয়াশিংটন্, কিংবা ইটালীর দেশহিতৈষী বীরশ্রেষ্ঠ ম্যাট্‌সিনি, কিংবা ঊনবিংশ শতাব্দীর গৌরবরবি মহাত্মা গ্লাড্‌ষ্টোন্ আসিয়া আমাদের দেশে উপস্থিত হন, তবে হিন্দুজাতি তাঁহাদিগকে চিনিবে না। হিন্দুজাতির নেতা ছিলেন তপস্বিরাজ শ্রীরামচন্দ্র, ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপক শ্রীকৃষ্ণ, সর্ব্বত্যাগী বিশ্বপ্রেমিক শুদ্ধোদন, পরমযোগী জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্য। এরূপ কোন তপঃপরায়ণ মহাপুরুষ ভিন্ন কেহ কখনও হিন্দুজাতির নেতা হইতে পারেন নাই, এবং বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছায় যদি কখনও আবার হিন্দুজাতির অভ্যুত্থান ঘটে, তবে সে এইরূপ কোন তপস্বী মহাপুরুষের শুভাবির্ভাবেই ঘটিবে। আজ হিন্দুজাতি একজন প্রকৃত নেতার অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব

করিয়া হাহাকার করিতেছে! সে শুভদিন কবে আসিবে,—যেদিন সেই মহাপুরুষের শুভাবির্ভাবে বহুযুগব্যাপী জীর্ণসংস্কারাভাবে হিন্দুসমাজের স্তরে স্তরে যে আবর্জ্জনারাশি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার অগ্নিময় করসংস্পর্শে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে? কবে এই বিশাল ধর্ম্মবিটপীর গাত্রে কালাত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন-সাম্প্রদায়িক মতভেদ-বশতঃ যে সকল স্বল্প-আলোকিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোটর নির্ম্মিত হইয়াছে, সেগুলি তাঁহার অঙ্গবিচ্ছুরিত-দিব্যজ্যোতিঃ-সঞ্চারে পূর্ণমধ্যাহ্নদীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হইবে, এবং এই জীর্ণশীর্ণ ধর্ম্মতরু নবজীবন লাভ করিয়া জাতীয়তার সজীবস্নিগ্ধ পুষ্পপল্লবে সুশোভিত হইবে?

কিন্তু এইরূপ কোন ধর্ম্মবীরকে আবাহন ও আকর্ষণ করিয়া আনিতে হইলে, আমাদেরও সাধনা চাই, তপস্যা চাই। বহু তপস্যার ফলে মর্ত্ত্যধামে তাঁহাদের শুভাগমন হয়। আমাদের এই দুর্গতির দিনে আমরা যেমন ওয়াশিংটন্, ম্যাট্‌সিনি, গ্লাড্‌ষ্টোন্‌কে চিনিব না, সেইরূপ রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্করকেও চিনিব না। বহুসাধনাদ্বারা নিজদিগকে তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী স্তরে উন্নীত করিতে পারিলে, তবে আমরা তাঁহাদের মহিমা সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে পারিব। কঠোর তপস্যাদ্বারা ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে পারিলে, আমরা তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিব। মেঘমালায় সঞ্চরণশীল বিদ্যুৎশিখা কেবল তখনই সনিনাদে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকে, যখন ভূপৃষ্ঠস্থ তড়িৎশক্তি সমানতেজে উদ্দীপ্ত হইয়া তাহাকে আকর্ষণ করে। সুতরাং মনুষ্যত্বলাভ করিতে

হইলে,—জাতীয়জীবন গঠন করিতে হইলে,—হিন্দুজাতির নেতাকে অভিনন্দন করিতে হইলে—আমাদের হৃদয়নিহিত ধর্ম্ম-বীজকে তপস্যাদ্বারা, সংযমদ্বারা, আচারঅনুষ্ঠানের দ্বারা বর্দ্ধিত করিতে হইবে। কঠোর তপস্যা ভিন্ন এ জাতির পুনরুত্থানের সম্ভাবনা নাই।

তপস্যাদ্বারা পূর্ব্বকালে কার্য্যসিদ্ধি হইত, এখন কি হয় না? ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখি, আমাদের এই ঘোর দুর্দ্দিনেও যেখানে যেখানে তপঃপ্রভাব কিছুমাত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেখানেই এক একটি জাতীয় অভ্যুত্থানের উদ্ভব হইয়াছে। যেমন কোন স্থানে বিন্দুমাত্র মিষ্টরস পড়িলে পিপীলিকাশ্রেণী তাহার অন্বেষণে ধাবিত হইয়া সেই মিষ্টরসের আস্বাদে মজিয়া যায়, এমন কি, সেই মিষ্টরসে পুঞ্জীকৃত হইয়া ডুবিয়া তাহাতে আত্মবিসর্জ্জন করে, সেইরূপ তপস্যা হিন্দুজাতির এতই প্রিয়, ধর্ম্ম হিন্দুজাতির জীবনের অন্নরসের সহিত এতদূর গূঢ় ও গাঢ়রূপে সম্বদ্ধ যে, এই বর্ত্তমান সময়েও যিনি যিনি নিজের জীবনে কিছুমাত্র তপোমাহাত্ম্য বিকশিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই হিন্দুসমাজের একএকটি নেতা বলিয়া পরিগণিত হইয়া একএকটি সম্প্রদায় গঠন করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে বর্ত্তমান সময়ে মহাবীর শিবাজীর বৈরাগ্য-দ্যোতক-গৈরিকপতাকা-তলে মহারাষ্ট্রীয় জাতীর এক মহাজাতীয়-অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল। এইরূপে সন্ন্যাসব্রত শিখগুরুর অধিনায়কতায় ভারতগৌরব শিখজাতির এক বিরাট্ অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল।

এইরূপে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসসাধনবলে বঙ্গদেশে এক তুমুল প্রেমতরঙ্গপ্রবাহ ছুটিয়াছিল। এইরূপে তপস্বিপ্রবর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তপঃসাধনার দৃষ্টান্তে বর্ত্তমান সময়েও আর্য্য-ধর্ম্মের এক বিশাল অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। শুধু তপস্যাদ্বারা মানব-জীবন কতদূর উন্নত হইতে পারে, তাহা এই শেষোক্ত মহাপুরুষের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। Mr. William Digby তাঁহার "Prosperous British India" নামক গ্রন্থে বলেন—

"During the last Century the finest fruit of British intellectual culture was probably to be found in Robert Browning and John Ruskin. Yet they were mere gropers in the dark compared with the uncultured and illiterate Ramkrishna of Bengal, who knowing naught of what we term learning, spake as no other man of his age spoke and revealed God to weary mortals"—(Chap. II.—P. 99).

সেই ত্রেতাযুগে আমরা দেখিতে পাই, ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র এক তপস্যাকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মর্ষিপদবীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই ঘোর কলিযুগেও আমরা দেখিতেছি, সেই তপস্যার বলে একটি অশিক্ষিত বিষয়বুদ্ধিহীন শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য সামান্য পূজারী ব্রাহ্মণ ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাগৌরবান্বিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার উজ্জ্বলতম

প্রদীপ Robert Browning ও John Ruskinকেও দিব্যজ্ঞানের আলোকে নিষ্প্রভ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালীসমাজেও তপস্যার ফল প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। আজ ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালীজাতি বুদ্ধিবলে, বিদ্যাবলে এতদূর উন্নত কিসে? এই জাতীয় অধঃপাতের দিনেও আর কোন্ প্রদেশ স্বল্পকালমধ্যে রামমোহন রায়, মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সমগ্র ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী এতগুলি রত্ন (আমি কোন জীবিত মহাত্মার নামোল্লেখ করিতেছি না) প্রসব করিতে সক্ষম হইয়াছে? ইহার কারণ—এই সকল মহাত্মাদিগের পিতৃপিতামহগণের তপস্যা। বর্ত্তমান সময়ে অনেক উদ্দামগতি সমাজসংস্কারক মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দনকে তাঁহাদের সংস্কারপথের বিষদিগ্ধ কণ্টক বলিয়া জ্ঞান করেন। বাজিকরগণ যেমন তাহাদের ভোজবাজি দেখাইবার পূর্ব্বে আত্মারাম সরকারকে একবার গালি না দিলে তাহাদের ভেল্কিবিদ্যা সিদ্ধ হইল না মনে করে, আমাদের সমাজসংস্কারকগণও রঘুনন্দনকে একবার গালি না দিলে তাঁহাদের সংস্কারচেষ্টা বিফল হইল মনে করেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালীসমাজ এই মহাত্মার নিকট বিশেষরূপে ঋণী। উক্ত মহাত্মা মন্বাদিস্মৃতি-সমুদ্র মন্থনপূর্ব্বক তাঁহার অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব সঙ্কলনদ্বারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মচর্য্যার পথ সুগম করিয়া দিয়া হিন্দুসমাজের যে মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীসন্ধ্যাবর্জ্জিত হইয়া এখন পর্য্যন্তও যে দারোয়ান ও পাচকশ্রেণীতে পরিণত হয় নাই,—এখনও যে উচ্চ-শ্রেণীর বাঙ্গালীর মধ্যে ক্রমাগত সহস্র সহস্র graduate ও under-graduate বাহির হইতেছেন,—তাহার অন্যতম কারণ রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্র। বিগত সহস্রাধিক বর্ষের পরাধীনতার প্রচণ্ড নিষ্পেষণে বাঙ্গালীজাতির মানসিক বৃত্তিনিচয় যে একেবারে ভগ্ন ও দলিত হইয়া যায় নাই, তাহার কারণ রঘুনন্দনের সংগৃহীত বিশুদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান-নিয়ম-সংযমের পালনদ্বারা উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালীর মনে পুণ্য ও পবিত্রতার বল সঞ্চিত হইয়া তাহাকে elastic (স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট) করিয়া রাখিয়াছে। সেই সকল কঠোর তপোনিয়ম এতদিন এ জাতিকে জীবিত রাখিয়াছিল*, কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার স্রোতে এখন সেই সকল সামাজিক স্বাস্থ্যপ্রদ আচার-অনুষ্ঠান ভাসিয়া যাইতেছে। এখন বাঙ্গালীসমাজে আহার-বিহারে, আচারঅনুষ্ঠানে সংযম-সহিষ্ণুতাশীলতার অভাব ক্রমেই সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। তাহার পরিবর্ত্তে সমাজে এক উদ্দম-উন্মুক্ত স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তাই এখন বাঙ্গালীর মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষণজন্মা পুরুষের সংখ্যা দিন-দিনই বিরল হইতেছে। বাঙ্গালীসমাজ এখন ক্রমেই নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

---

* ভারতগৌরব স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিন হইতে ইহার বিপরীত মত পোষণ করিয়া নানা প্রবন্ধ গল্প নাটকাদিদ্বারা সেই মত প্রচার করিতেছেন। আমি অন্য প্রবন্ধে তাঁহার মতের আলোচনা করিয়াছি।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্য ও সমাজ

বড় আশা ছিল, নবোদ্ভূত বঙ্গসাহিত্য দ্বারা বঙ্গসমাজ আবার সুসংস্কৃত হইয়া পুণ্য ও পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইবে। সাহিত্য-সেবিগণের প্রথম উদ্যমে এইরূপ আশাসঞ্চারের যথেষ্ট কারণও ছিল। কিন্তু আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য, আজকাল সাহিত্যক্ষেত্রে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যাইতেছে, তদ্দ্বারা সমাজের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিশেষ অপকার সাধিত হইতেছে। যে সাহিত্য জনসমাজকে পুণ্য ও পবিত্রতার পথে আকর্ষণ করিয়া এক মহৎ লক্ষ্য ও উচ্চতম আদর্শের দিকে লইয়া যায়, সেইরূপ সাহিত্য-দ্বারাই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। পরন্তু যে সাহিত্য জাতীয় জীবনের উচ্চতম আদর্শ ভুলিয়া গিয়া সমাজের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা, অমিতাচার ও অসংযমরূপ লেলায়মান বহ্নিকে পুষ্ট করিবার জন্য তাহাতে আপাতমনোরম মাদকতাময় মোহময় গ্রন্থরূপ ঘৃতাহুতি প্রদান করে, সে সাহিত্যদ্বারা সমাজ অধিকতর কলুষিত হয়। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইব, বর্ত্তমান সময়েও তাহাই হইতেছে। মানবহৃদয়ে যতপ্রকার বৃত্তি আছে, তাহার মধ্যে প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও দুর্দ্দমনীয়। প্রেমের ন্যায় আবেগময়, আবেশময়, মোহময়, মদিরাময় বৃত্তি আর নাই। প্রেমই আমাদের সমাজ-বন্ধনের রজ্জু এবং কাব্যকলার উপাদান। এই প্রেমের উদ্দাম উদ্দীপনাদ্বারা সমাজের যে গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, তাহা আমাদের ঋষিগণ বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যুবকযুবতীর

প্রেমলীলাময় গান্ধর্ব্ববিবাহ সমাজ হইতে তুলিয়া দিয়া এবং বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তিত করিয়া হিন্দুসমাজে দাম্পত্য-প্রীতিকে একটি শান্তিময় সুস্নিগ্ধ স্তিমিতপ্রবাহ দেবখাতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের পাশ্চাত্য-আদর্শ-প্রিয় কবিগণ দেখিলেন, প্রেমকে এরূপ গার্হস্থ্যজীবনখাতে মৃদুমন্দগতিতে এক-ঘেয়েভাবে প্রবাহিত হইতে দিলে সেই অভিনবরসবিহীন—romance শূন্য—জীবনের সার্থকতা কি, আর কাব্যকলারই বা উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি হইবে কেন? সেজন্য কাব্যকলায় নবনব রসসৃষ্টির অভিপ্রায়ে এবং সমাজমধ্যে স্বাধীন প্রেমের উন্মুক্ত তরঙ্গ ছুটাইবার জন্য তাঁহারা পাশ্চাত্য আদর্শে কাব্যরচনা আরম্ভ করিয়াছেন। বড়ই ক্ষোভের বিষয়, যে সকল গ্রন্থকারের উজ্জ্বল প্রতিভায় আজ বঙ্গীয় সাহিত্য গৌরবান্বিত, তাঁহারাই এই সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার পথ-প্রদর্শকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অবাধ প্রেমের বিচিত্র-লীলা প্রদর্শন করিতে না পারিলে উপন্যাস জমে না স্বীকার করি, কিন্তু তাহারও একটা সুসংযত সীমা থাকা কর্ত্তব্য। সমাজে নরনারী-চরিত্রের উপর আপাতমধুর সাহিত্যের কতদূর প্রভাব, ইহা গ্রন্থ-কারদিগের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ঔপন্যাসিক-প্রেমচিত্রদ্বারা স্বাধীনপ্রেমের লীলাভূমি পাশ্চাত্যসমাজে যে কত গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা আজকাল কোন কোন পাশ্চাত্য গ্রন্থকার স্পষ্টাক্ষরে দেখাইতেছেন। এই প্রসঙ্গে Marie Corelli প্রণীত "Sorrows of Satan" এবং Mrs. Henry Wood প্রণীত "East Lynne" উপন্যাস বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য-

সমাজে প্রেমকে অতিমাত্র স্বাধীনতা দিতে দিতে এখন তাহার পাখা হইয়াছে; সে এখন সুদূর সূক্ষ্মতম আকাশে—Ethereal regionএ—উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে; সে এখন সাধারণ-ঘরকন্না-রূপ খুঁটিনাটির মধ্যে অবরুদ্ধ ও আবদ্ধ থাকিয়া নিজকে ধূলিমলিন করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। পাশ্চাত্যসমাজে স্বামী এখন স্ত্রীর নিকট হইতে আদর-অনুরাগ-স্নেহ সবই পাইতেছেন, কেবল পান না সেই অদ্ভুতরহস্যময় বস্তুটি অর্থাৎ love বা প্রেম। স্ত্রীর নিকট হইতে সেই সূক্ষ্মতম পদার্থটি লাভ করা কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটে। কারণ love বড় ethereal—আকাশশরীরী, তাহা কাহাকেও ধরাছোঁয়া দেয় না—তাহা নর-নারীর ইচ্ছাধীন নহে—তাহা নরনারীর ইচ্ছাশক্তির অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছে;—"It is a capricious passion and generally comes without the knowledge, against the will." অবাধ উন্মুক্ত স্বাধীনপ্রেমের কি অদ্ভুত পরিণাম!

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রেমবৃত্তিটি বড় দুর্দ্দমনীয়। একবার রাশ ছাড়িয়া দিলে সেই দুষ্ট অশ্বকে সংযত করিতে পারে, এরূপ সারথি কে আছে? সেই অসংযত দুষ্ট অশ্ব প্রবলবেগে ছুট পাইয়া পাশ্চাত্যসমাজে নরনারীকে অনবরত সংসারের খাতে ফেলিতেছে। কত কত মূল্যবান জীবন প্রেমবিপাকে পড়িয়া বিফল হইয়া যাইতেছে। আবার দাম্পত্যপ্রেমও অত্যধিকমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া নরনারীর হৃদয় একচেটিয়া দখল করিয়া বসিয়াছে। ঈশ্বরে ভক্তি ত

অতিদূরের কথা, এমন কি, পিতামাতা-ভাইভগিনীর জন্যও পাশ্চাত্যহৃদয়ে এতটুকু স্থান সঙ্কুলান হওয়া কঠিন। স্ত্রী আসিয়া স্বামীর হৃদয় একেবারে পূর্ণমাত্রায় দখল করিয়া বসিলেন, তাহাতে আর কাহারও স্থান হইবার সম্ভাবনা রহিল না। একটি সুসংযত হৃদয়ে একই সময়ে ঈশ্বরে প্রীতি, পিতামাতার প্রতি ভক্তি, স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, ভাইভগিনী ও অন্যান্য আত্মীয়বন্ধুর প্রতি স্নেহ,—এবং একই পরিবারে ইঁহাদের সকলের একত্র অবস্থান, এই নেত্র-প্রীতিকর দৃশ্য কেবল ঋষিদিগের তপঃপূত সুসংস্কৃত সুনিয়ন্ত্রিত হিন্দুপরিবারেই দেখা যায়। হিন্দুপরিবার বিশ্বপ্রীতিশিক্ষার নিলয়, তাই এখানে প্রীতির বহুমূর্ত্তিতে—বিবিধ ভাবে পরিণতি। তুমি সহধর্ম্মিণী—বিবাহ করিয়া আনিয়া তোমাকে আমার আত্মার অর্দ্ধাংশ দান করিয়াছি সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ করি নাই—এই যুক্ত পরিবারে আমার আর পাঁচজন যেমন আমার আত্মার সহিত মিলিয়া এক হইয়া আছে, তুমিও তাহাদের মধ্যে মিলিয়া থাক—আমার আর পাঁচজনকে পরিত্যাগ করিয়া, একলা তোমাকে লইয়া আমি কি করিব? হিন্দুহৃদয়ে সহধর্ম্মিণীর ইহাই ন্যায্য অধিকার। হিন্দুপত্নী ইহাতেই সন্তুষ্টা। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোন লোকসানও নাই। তিনি স্বামিহৃদয়ের একমাত্র প্রেমনায়িকা না হইতে পারিয়া পাশ্চাত্যপত্নীর তুলনায় যেটুকু আদর ও সোহাগ কম পাইতেছেন, সন্তানগণের জননীরূপে, ভ্রাতার ভগিনীরূপে, পিতামাতার কন্যারূপে এবং একপরিবারস্থ অন্যান্য সকলের আনন্দদায়িনী সহচরী বা আত্মীয়ারূপে সেই

আদর ও সোহাগের শতগুণ সুদসমেত লাভ করিতেছেন। ইহাই হিন্দুগৃহিণীর বিশেষ গৌরব। কিন্তু এই গৌরবান্বিত পদ লাভ করিবার জন্য হিন্দুপত্নীকে দ্রৌপদীর ন্যায় তপস্বিনী হইতে হইবে। তাই বড়ই দুঃখের বিষয়, বঙ্গীয়সাহিত্যরথিগণের রচিত পাশ্চাত্যাদর্শ-বহুল-নাটক-নবেল-পাঠের ফলে হিন্দুপরিবারে এইরূপ আদর্শগৃহিণীর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। সংযম, সহিষ্ণুতা, শীলতা প্রভৃতি শোভনীয় গুণসকল হিন্দুপরিবার হইতে দিন দিন অন্তর্হিত হইতেছে। সাহিত্যরথিগণ হিন্দুর সুসংযত চিত্তে নিত্য নব ভোগলালসা জাগরিত করিয়া সমাজের বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতেছেন।

শাস্ত্রের শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা

হয়ত কেহ বলিবেন, কঠোর ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনে হিন্দুজাতির মানসিক শক্তিসমূহ নিষ্পেষিত ও দলিত হইয়া গিয়া সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। সে সকল কঠোর শাসনের ব্যবস্থা আর কেন? এখন অন্যান্য সুসভ্য জাতিসকল যেমন ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন আচারব্যবহার, স্বাধীন কর্ম্মপথসকল অবলম্বন করিয়া সমুন্নত হইয়াছে, আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে। ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে, শুধু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যথেচ্ছ ব্যবহারদ্বারা কখন কোন জাতি উন্নতিলাভ করিতে পারে না। যে জাতি যত বড় হইয়াছে, সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিই জাতীয় কর্ত্তব্য-বুদ্ধির নিকট তত অধিক মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছে। মুখের কথায়—প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন; কিন্তু কার্য্যতঃ প্রত্যেক

ব্যক্তি জাতীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধির অধীন। ইংরেজ, ফরাসী, রুষ, জার্ম্মাণ, জাপান জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব জাতির হিতাকাঙ্ক্ষায় জীবন বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প বলিয়া এই সকল জাতি এতদূর রাষ্ট্রীয় সমুন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে। জার্ম্মাণজাতীয় প্রত্যেক পুরুষ কতক বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধকার্য্য শিক্ষা করিতে বাধ্য। আজ জাপানীর শৌর্য্যবীর্য্যপরাক্রম দেখিয়া সমগ্র পৃথিবী স্তম্ভিত, কিন্তু জাপানী-দিগের এই সকল গুণ কত কঠোর সাধনাবলে অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা আমরা কয়জনে অনুসন্ধান করি? সম্প্রতি জাপানপ্রবাসী একজন বাঙ্গালী কোন সাপ্তাহিক পত্রিকায় জাপানীদিগের, স্বদেশের হিতকল্পে, কঠোর সাধনার কথাপ্রসঙ্গে বলেন—

"জাপানের ক্ষত্রিয়সমাজ 'সামুরাই' নামে পরিচিত। ইহাদের শৌর্য্যসাহসের পরিচয়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই সামরিক জাতির অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা পূর্ব্বকালের স্পার্টান্দিগের অনুরূপ; বরং অনেকবিষয়ে তাহাদের অপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়কর। অতি বাল্যকাল হইতে সামুরাইকে সহিষ্ণুতার আধার করিয়া তুলিবার জন্য পিতামাতারা বিশেষ যত্ন-প্রকাশ করিয়া থাকে। সহিষ্ণুতাশিক্ষার জন্য বালকবালিকাদিগকে প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিয়া নগ্নপদে বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে হয়। শীতকালে এইরূপ খালিপায়ে বরফের উপর দিয়া গুরুগৃহে যাইতে হয়। তাহাদের যাহাতে রাত্রিজাগরণের অভ্যাস হয়, সে বিষয়েও অভিভাবকেরা যত্নের ত্রুটি করেন না। মাসের মধ্যে অন্ততঃ দুইদিন সমস্তরাত্রি জাগিয়া বালকবালিকাদিগকে

উচ্চৈঃস্বরে পাঠ আবৃত্তি করিতে হয়। ক্ষুধাবিজয় জাপানী ক্ষত্রিয়-বালকদিগের শিক্ষার তৃতীয় অঙ্গ। দীর্ঘকাল অক্লেশে অনশনে যাপন করিতে অসমর্থ হওয়া সামুরাইবালকের পক্ষে ঘোর লজ্জার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই সকল শিক্ষায় বালক-বালিকাদের দেহ সুদৃঢ় হইলে সামুরাই-জনকজননী তাহাদিগকে নির্ভীক করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। যে সকল স্থানে ভূতের উপদ্রবের ভয়ে সাধারণ লোকে যাইতে সাহসী হয় না, সেই সকল স্থানে ও ভীষণ শ্মশানভূমিতে অতি অল্পবয়স্ক সামুরাইবালককে পুনঃপুন গমন করিতে বাধ্য করা হয়। কোন ব্যক্তির শিরশ্ছেদের দণ্ড হইলে রাত্রিকালে একাকী বালকদিগকে বধ্যভূমিতে গমনপূর্ব্বক নিহত ব্যক্তির দেহস্পর্শ ও ছিন্নমস্তকে কোনপ্রকার চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া আসিতে হয়।” ইত্যাদি।

'হিতবাদী'—৮ই মাঘ, ১৩১০।

জাপানীদিগের জাতীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধির চরণতলে এইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বলিদানকে কি বলিব? ইহাই ত তপস্যা। জাপানীজাতি পাশ্চাত্যসভ্যতার ভোগবিলাসতরঙ্গে গা ছাড়িয়া না দিয়া, তাহার মধ্য হইতে যতটুকু স্বকীয় জাতি ও স্বকীয় সমাজের হিতকল্পে উপযোগী, তাহাই ছাঁকিয়া লইয়াছে। আর আমরা? আমরা সেই বাহ্যচাকচিক্যময় সভ্যতার কুহকে পড়িয়া আমাদের জাতীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধি ভুলিয়া সেই সভ্যতার ভোগবিলাসপ্রবাহে কাষ্ঠ-তৃণবৎ ভাসিয়া যাইতেছি।

সুখস্বচ্ছন্দতার মাপকাঠি

পাশ্চাত্যজাতি আমাদিগকে অহরহ ইহাই বলিয়া টিটকারী দেন যে, আমরা অসভ্য, আমাদের—standard of comfort নিতান্ত low—অর্থাৎ আমাদের বাহিক সুখস্বচ্ছন্দতার মাপকাঠিটা নিতান্ত ক্ষুদ্র। তাঁহাদের তুলনায় আমরা শারীরিক ও মানসিক সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি অধিক লক্ষ্য করি না, নিত্য নূতন সুখের জিনিষ ও সখের জিনিষের জন্য আমরা অধিক অর্থব্যয় করিতে পারি না। তাঁহাদের এই তিরস্কারে ভীত হইয়া এবং পাশ্চাত্যসভ্যতার বাহিক জাঁকজমকে মুগ্ধ হইয়া আজ আমরা ক্রমাগতই তাঁহাদের অনুকরণে নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টিপূর্ব্বক তাহাদের পরিপূরণের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া দরিদ্রতার বৃদ্ধি করিতেছি। কিন্তু ইহার যে কি ভীষণ পরিণাম, তাহা আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না। এই standard of comfort বৃদ্ধি করিতে গিয়া পাশ্চাত্যজাতি-সকল কি ঘোরতর অশান্তিতে কালযাপন করিতেছে, তাহা আমাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। এখন পাশ্চাত্যসভ্যতা-বিস্তারের অর্থ এই—তোমরা তোমাদের ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য নিত্য নূতন বস্তুর আবিষ্কার কর, সেই সেই বস্তু প্রাপ্তির জন্য সদুপায়ে হউক অসদুপায়ে হউক অর্থসংগ্রহ কর, সেই অর্থ স্বদেশে না মিলিলে তাহা লাভের জন্য অন্যদেশ অধিকার কর, অন্যজাতির সর্ব্বস্ব অপহরণ কর, অন্যজাতিকে যুদ্ধবিগ্রহদ্বারা

ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ কর। যদি অন্য কোন ক্ষমতাশালী জাতি সেই ক্ষেত্রে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, তবে তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। সে জাতি যদি দশলক্ষ সৈন্য, দশহাজার কামান সংগ্রহ করিয়া থাকে, তবে তোমরা বিশহাজার সৈন্য ও বিশহাজার কামান সংগ্রহ কর। যদি সেই জাতি পাঁচখানা রণতরী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে, তবে তোমরা দশখানা প্রস্তুত কর। এইরূপে সুসভ্য জাতিবৃন্দের দুর্দ্দমনীয় ভোগলালসা হইতে পৃথিবীতে রাবণের চিতাবহ্নির ন্যায় সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছে।* ইহাই কি মহাগৌরবান্বিত পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিণাম? পরমেশ্বর কি এইরূপ পাশব বৃত্তিসকল চরিতার্থ করিবার জন্য মানবজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন? জগতে শান্তি, প্রীতি, পবিত্রতার রাজত্ব কি কথনও প্রতিষ্ঠিত হইবে না? জগতে কি কথনও সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার পবিত্রবন্ধনে মানবমণ্ডলী সংবদ্ধ হইবে না?

আমাদের দেশে আজ যাঁহারা জাপানের সুখসমৃদ্ধি শৌর্য্যবীর্য্য দেখিয়া সেদিকে সতৃষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি —যে তপস্যাবলে জাপান আজ বহুকালব্যাপী সুষুপ্তির ক্রোড় হইতে জাগ্রত হইয়া জগতের সমক্ষে গৌরবমণ্ডিত মস্তক উন্নত করিয়াছে, আমাদিগকেও সেইরূপ তপস্যা করিতে হইবে।

* রাবণের সেই চিতানল কালক্রমে পৃথিবীব্যাপী দাবানলে পরিণত হইয়া এখন রুদ্রদেবের প্রলয় লীলা প্রকটিত করিতেছে। নিরতিশয় পাশব বলবুদ্ধির ইহাই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম!

পাশ্চাত্যসভ্যতার ভোগবিলাসে মজিলে কখন এ জাতির উন্নতি হইবে না। একথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, পাশ্চাত্যজাতিরা সভ্যতার যে মাপকাঠি বাহির করিয়াছে, তাহাই জগতে একমাত্র মাপকাঠি নহে। তাহারা যে standard of comfort আমাদিগকে দেখাইতেছে, তাহাই একমাত্র standard of comfort নহে। বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণের তপোবলে প্রাচীন ভারতে যে আর্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—যাহার প্রভাব এখনও চীন-জাপানে, এমন কি, সমগ্র এশিয়াখণ্ডে অল্পমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে, আমরা সেই মহাগৌরবান্বিত আর্য্যসভ্যতার উত্তরাধিকারী। পাশ্চাত্যসভ্যতার যেমন একটা standard of comfort আছে, সেই আর্য্যসভ্যতারও তেম্‌নি একটা standard of comfort ছিল। পাশ্চাত্যসভ্যতার standard হইতেছে শরীর ও মনের তৃপ্তি। আর্য্যসভ্যতার standard ছিল আত্মার তৃপ্তি। পাশ্চাত্যসভ্যতার নিরিখে তিনিই তত উচ্চপদস্থ ও সম্মানিত, যিনি যত অধিক পরিমাণে অর্থ শুষিয়া লইয়া নিজের ব্যাঙ্ক্ পূরণ করিবেন—যিনি উচ্চ অট্টালিকায় বাস করিবেন,—যিনি অধিক-পরিমাণে অর্থব্যয় করিয়া নিজের ও পরিজনবর্গের উত্তম বেশভূষা, আহারবিহার ও আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা করিবেন—যিনি সর্ব্বসাধারণকে নিজের প্রভুত্বাধীনে রাখিতে পারিবেন। আর আর্য্যসভ্যতার নিরিখে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও পূজিত যাঁহার এ সংসারে আপনার বলিবার কপর্দ্দকও নাই, অথচ যাঁহার কিছুমাত্র অর্থলিপ্সা নাই—যাঁহার বাস করিবার জন্য একখানি

গৃহও নাই, অথচ যিনি তাহার কিছুমাত্র অভাববোধ করেন না—যিনি আহারবিহারবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বীতস্পৃহ—যিনি পরের অনিষ্ট করিবার জন্য কিছুমাত্র ক্ষমতা চাহেন না, যিনি বসনভূষণসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন, মান-অপমান যাঁহার নিকট তুল্য—যাঁহার নিকট শত্রুমিত্রের ভেদ নাই—যিনি আত্মতৃপ্ত, আত্মারাম। শুদ্ধ আত্মার তৃপ্তির জন্য ভারতবাসিগণ প্রাচীনকালে ধন-মান, রাজ্য-ঐশ্বর্য্য, সুখসম্পদ্ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতেন। ইহার বহু উদাহরণ রামায়ণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।* আমাদের বর্ত্তমান সময়ে যদি কোন রাজকুমার কিংবা বড়লোকের ছেলে তীর্থদর্শনে গমন করেন, তবে তাঁহার বেশভূষা-চাকর-খানসামা প্রভৃতির ষোল-আনা ঘটা দেখিয়া চক্ষুস্থির হয়। কিন্তু একদিন অযোধ্যার—এমন কি, সমগ্র ভারতবর্ষের সম্রাট্ দশরথের দুইটি কিশোরবয়স্ক কুমার তাড়কাবধের নিমিত্ত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত নানাদিগ্‌দেশপর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহারা কি বেশে কতজন ভৃত্য লইয়া বাহির হইয়াছিলেন? আমরা

* এখানে তুলনা দ্বারা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আর্য্য সভ্যতার পার্থক্য (contrast) দেখান হইতেছে। নতুবা গৃহস্থমাত্রকেই কপর্দ্দকশূন্য হইয়া বনবাসী হইতে হইবে আর্য্যসভ্যতা প্রবর্ত্তকগণের এরূপ কখনও অভিপ্রায় ছিল না। যে সকল হিন্দুরাজা রাজ্যজয় করিয়াছেন, কুবেরের ভাণ্ডার লুটিয়া আনিয়াছেন, তাঁহারাই আবার সর্ব্বস্ব দান করিয়া বনবাসী হইয়াছেন। ধনসঞ্চয় ব্যতীত জাতীয় সমৃদ্ধি লাভ হইতে পারে না, ইহা সর্ব্বকাল-সমাদৃত সত্য।

দেখিতে পাই, রামলক্ষ্মণ তাঁহাদের রাজোচিত বেশভূষা ত্যাগ করিয়া সেই তপস্বীর সঙ্গে তপস্বিবেশে বহির্গত হইয়াছিলেন, এবং বহুদিন পর্যান্ত তাঁহার ন্যায় কখন ফলমূলাশনে, কখন বা অনশনে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। রামলক্ষ্মণ ছিলেন অসভ্য, কারণ তাঁহাদের standard of comfort নিতান্ত ছোট ছিল। আর আমরা মহাসভ্য, কারণ আমাদের standard of comfort তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ!

পাশ্চাত্যসভ্যতার ঐন্দ্রজালিক মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়াতে আমাদের নৈতিক অবস্থাও দিন দিন শোচনীয় হইতেছে,—আমরা মনুষ্যত্ব হারাইতেছি। যতই আমাদের অট্টালিকাআস্‌বাব্‌, পোষাকপরিচ্ছদ, আদবকায়দার ঘটা বাড়িতেছে, ততই আমাদের আত্মার বল কমিয়া আসিতেছে। ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে চা-পান-করাটা কেবল সাহেবিয়ানাগ্রস্ত উচ্চশ্রেণীর বড়লোকদিগেরই রীতি ছিল, কিন্তু এই ১৫ বৎসরের মধ্যে ইহা প্রত্যেক মধ্যবিত্ত, এমন কি, অনেক দরিদ্র পরিবারেরও নিত্যক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে। এতাবৎকাল শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার কঠিন পরীক্ষা করা হইয়াছে, নচেৎ আমি আর অনেক দৃষ্টান্ত-দ্বারা দেখাইতে পারিতাম, শুধু পাশ্চাত্যসভ্যতার খাতিরে আমরা আরও কতপ্রকার অভাব উদ্ভাবন করিয়া আমাদের দরিদ্রতার বৃদ্ধি করিতেছি। আমরা মুখে "ভারতের দরিদ্রতা" বলিয়া কত আন্দোলন করি, কত রিজোলিউশন্‌ পাস্‌ করি, কত হাহুতাশ করি,—কিন্তু দেশের দরিদ্রতা আমরা কতটা

নিজেরাই বৃদ্ধি করিতেছি, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। আমাদের পিতৃপিতামহগণ এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সারা দিনরাত্রি খালি গায় কাটাইতেন, অথচ তাঁহারা দীর্ঘজীবী ও নীরোগ ছিলেন। আমাদের কিন্তু অষ্টপ্রহর গেঞ্জী কিংবা শার্ট গায় না দিয়া থাকিলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। অথচ আমাদের রোগ চিরদিন একটা-না-একটা লাগিয়াই আছে, এবং আমাদের আয়ু প্রায় পঞ্চাশ পার হয় না। যাহা হউক, যাঁহার অর্থ আছে, তিনি যেন এরূপ জামাকাপড় ব্যবহার করিতে পারিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুকরণে পরাণমাঝির পুত্র যে আট আনা দিয়া ঐ কালোডোরাযুক্ত বিলাতী গেঞ্জী কিনিয়া নৌকা বাহিবার সময় গায় দিয়াছে, ও কি আর উহার পিতার মত শীতকালের রাত্রে হিমের মধ্যে জলে ডুব দিয়া মাছ ধরিতে পারিবে? কখনই না। দেশের ভদ্রলোকদিগের অনুকরণে গরিবশ্রেণীও বিলাসিতার পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে। পূর্ব্বে কলিমদ্দী শেখ যখন তাহার ক্ষেত্রে চাষ করিতে যাইত, তখন মাটির বাসনে ও পিতলের ঘটীতে তাহার প্রাতরাশের জন্য ভাত ও জল আসিত। কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এখন enamelled plate, enamelled cups, enamelled glass (এনামেলের বাসন) না হইলে তাহার সেই ভাত ও জল আসে না। এইরূপ আর কত দৃষ্টান্ত দিব? আমাদের বিলাসিতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনের স্পৃহা বাড়িতেছে—তাহা না হইলে খরচ কুলাইবে কেন?—How to make both ends meet?

আমরা এইরূপে নিজেদের বিলাস-প্রিয়তাদ্বারা দেশের অভাব বৃদ্ধি করিতেছি, অথচ আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সকল উপায়ে দরিদ্রদের অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতেন, আমরা সেগুলি একে একে পরিত্যাগ করিতেছি। আমাদের দেশে গৃহস্থমাত্রেরই অতিথিসংকার একটি অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই পবিত্র অনুষ্ঠানের দ্বারা যেমন অনেক অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি গৃহস্থের আলয়ে আশ্রয় পাইত, তেমন গৃহস্থও সর্ব্বজন-প্রীতির অনুশীলন দ্বারা হৃদয়ের প্রশস্ততা লাভ করিতেন। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই অতিথিসৎকার এখন হিন্দুসমাজ হইতে উঠিয়া যাইতেছে। এখন আমরা আমাদের কতশত কৃত্রিম অভাব পূরণ করিতেই ব্যস্ত, অতিথিসেবার ব্যয় বহন করিতে পারিব কেন? আমাদের ভারতসম্রাট্ মহামতি এড্‌ওয়ার্ডের শুভ-অভিষেকোপলক্ষে তাঁহার প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের শুভ আকাঙ্ক্ষায় অনেকগুলি দরিদ্রলোক একবেলা আহারের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিল, সেজন্য বিলাতে এক মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কারণ—এরূপ অনুষ্ঠান সে দেশে অশ্রুতপূর্ব্ব। কিন্তু আমাদের দেশে যে নিতান্ত গরীব, তাহারও পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে কিম্বা পূজাপার্ব্বণে অনেক প্রতিবেশী নিমন্ত্রিত হইয়া থাকে। হিন্দুর কোন শুভকর্ম্ম যাগযজ্ঞ এইরূপ সর্ব্বসাধারণের প্রীতিভোজ ব্যতিরেকে সকল ও সুসিদ্ধ হয় না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই—হিন্দু জানেন যে, এইসকল পূজাপর্ব্বাদিতে যে দেবতার অর্চ্চনা করা হয়, এই বিশ্ব তাঁহার দেহ। তিনি বৈশ্বানর—বিরাট্—

সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। তাই বিশ্বজনের তৃপ্তিতে তাঁহার তৃপ্তি,—বিশ্বজনের প্রীতিতে তাঁহার প্রীতি,—বিশ্বজনের সন্তোষে তাঁহার সন্তোষ। তাই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অন্তঃকরণ যেমন উদার ছিল, তাঁহাদের নিমন্ত্রিতমণ্ডলীও তেমনই ব্যাপক ছিল। আমরা সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহার্য্যের সংখ্যা ও রসমাধুর্য্য ক্রমেই বৃদ্ধি করিতেছি বটে, কিন্তু নিমন্ত্রিতের সীমাটা ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইতে হইতে এখন মাত্র ৫।৭টি select friendsএ—বাছাই করা অন্তরঙ্গে—পরিণত হইয়াছে। এইরূপে আমরা মুখে যতই দরিদ্রের বন্ধু বলিয়া আত্মগুণ ঘোষণা করিতেছি, ততই যে সকল দ্বার দিয়া আমাদের উপার্জ্জিত অর্থ অতি অল্পপরিমাণেও দরিদ্রের হাতে গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল, সেই সকল আঁটঘাট খুব airtight—নিশ্ছিদ্র করিয়া বন্ধ করিতেছি। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কলকারখানা-শিল্পবাণিজ্যাদি দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্রপোষণের ব্যবস্থা নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলিয়া দেশের দরিদ্রতানিবারণের জন্য যে সকল বিধিব্যবস্থা আমাদের ব্যক্তিগত আয়ত্তাধীন রহিয়াছে, তাহাদের অনুষ্ঠান না করা যে গুরুতর সামাজিক ও নৈতিক পাপ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

উপসংহার।

এই সকল সামাজিক ও নৈতিক পাপক্ষালনের জন্য এখন আমাদিগকে কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। দীর্ঘকালব্যাপী

বহুবিধ সামাজিক দুর্গতির জন্য আমাদের যে অধোগতি হইয়াছে, তাহা হইতে পুনরুত্থানের জন্য আমাদিগকে কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। বাহ্যচাকচিক্যময়ী পাশ্চাত্যসভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের যে সকল মানসিক ও সামাজিক দুর্গতি ঘটিতেছে, তাহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য আমাদিগকে তপস্যা করিতে হইবে। আমরা যে মনুষ্যত্ব হইতে দিন দিন স্খলিত হইতেছি, তাহা পুনর্ব্বার লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে তপস্যা করিতে হইবে। এই ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি লইয়া একটা বিশাল জাতীয়তাসৃষ্টি অনেক দূরের কথা, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় যাহাতে কেবল নানাদেশবাসী বিভিন্নবর্ণসম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুসমাজ লইয়া একটা জাতীয়বন্ধন ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়, যাহাতে আমাদের মধ্যে একটা সামাজিক কর্ত্তব্যজ্ঞান—জাতীয় কর্ত্তব্যজ্ঞান ফুটিয়া উঠে, যাহাতে আমরা গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, প্রীতি ও দাক্ষিণ্যাদি গুণের বিকাশ করিতে সমর্থ হই, সেজন্য আমাদিগকে কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, এখন কালের স্রোত ফিরান অসম্ভব—কালের স্রোতে ভাসিয়া যাওয়াই সঙ্গত। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, এই বিশ্বরাজ্যের একচ্ছত্র স্রষ্টা, পাতা ও বিধাতা আছেন। তিনি কালের কর্ত্তা এবং কালের নিয়ামক। তাঁহারই ভয়ে চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহনক্ষত্র—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আমরা যদি তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যসাধন করিয়া যাইতে পারি, তবে অবশ্যই আমাদের মঙ্গল

হইবে। তাঁহার প্রীতির জন্য হৃদয়ের একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা চাই। তিনি আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, তখন সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার পুনরাদেশের অপেক্ষা করিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে ভগবান্ এই শেষ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া যন্ত্রের ন্যায় তাহাদিগকে চালাইতেছেন। অতএব হে অর্জ্জুন, একমাত্র তাঁহারই শরণাপন্ন হও,—তাঁহার প্রসাদে তুমি শান্তি ও অবিনশ্বর স্থান প্রাপ্ত হইবে। ঋষিকল্প এমার্সন বলিয়াছেন—

"A little consideration of what takes place around us every day would show us, that a higher law than our will, regulates events; that our painful labours are unnecessary and fruitless; that only in our easy, simple, spontaneous action are we strong, and by contenting ourselves with obedience we become divine. Belief and love—a believing love will relieve us of a vast bond of care. O

my brothers, God exists. There is a soul at the centre of nature, and over the will of every man, so that none of us can wrong the universe...We need only obey. There is a Guidance for each of us, and by lowly listening we shall hear the right word."—*Spiritual Laws.*

সেই সর্ব্বনিয়ামক, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বিশ্ববিধাতার প্রীতির জন্য আমাদিগকে তপস্যা করিতে হইবে। আমাদের আরও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, প্রকৃতিবৈচিত্র্য সেই বিশ্ববিধাতার সৃষ্টির এক গূঢ়রহস্য। পৃথিবীর সকল জাতি একই পন্থা অবলম্বন করিয়া সমুন্নত হইবে, ইহা যদি তাঁহার অভিপ্রায় হইত, তবে তিনি সকল জাতিকেই একই উপাদানে সৃষ্টি করিয়া একই প্রকার প্রাকৃতিক প্রভাবের মধ্যে স্থাপন করিতেন। কে জানে, এই অধঃপতিত হিন্দুজাতির দুর্গতির মধ্যেও তাঁহার মঙ্গলবিধানের বীজ নিহিত নাই? যখন সমগ্রদেশ বন্যার জলে ভাসিয়া যায়, তখন কৃষক তাহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট শস্যের বীজ একটু অল্পপরিসর উচ্চভূমিতে বপন করিয়া রাখে, এবং পরে বন্যা ছাড়িয়া গেলে সেই বীজোৎপন্ন অঙ্কুর তাহার সমস্ত ক্ষেত্রে লাগাইয়া দেয়। আজ যখন সমগ্র পৃথিবী সুসভ্যজাতিগণের আসুরিক-বল-প্রসূত ভীষণ বিদ্বেষ, জিঘাংসা, স্বার্থপরতা ও শোণিতপিপাসার বহ্নিতে সমাবৃত হইয়া পড়িয়াছে, তখন কে জানে, বিধাতার মঙ্গল-বিধানে এই ক্ষুদ্র-দেশে, হিন্দুজাতির মধ্যে, প্রাচীনসভ্যতাপ্রসূত শান্তি, প্রীতি,

পবিত্রতা প্রভৃতি গুণনিচয়ের বীজ জগতের ভাবী মঙ্গলের জন্য রক্ষিত হইতেছে না? কে জানে, এই সকল দুর্দ্ধর্ষজাতি যখন পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহদ্বারা ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, যখন অবিরত ভোগলালসার চরিতার্থতাদ্বারা তাহাদের হৃদয়ে অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা এই ঋষিপ্রবর্ত্তিত প্রাচীন-সভ্যতার প্রীতিপবিত্রতাময়ী শান্তিসুধাপানের জন্য কাতরকণ্ঠে লালায়িত না হইবে?*

তাই আমার মনে হয়, আমাদের জাতীয় জীবনের এই মহা-পরিবর্ত্তনসময়ে,—transition periodএ—আজ যখন আমরা আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যস্থলে,—ভোগ-সংযম ও ভোগপিপাসার সঙ্গমস্থলে—নিবৃত্তিমার্গ ও প্রবৃত্তিমার্গের সন্ধিস্থলে—দাঁড়াইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছি, তখন আমাদের জাতীয়ইতিহাস—রামায়ণরূপ অভ্রভেদী শৈলশিখরে, সেই আদর্শব্রাহ্মণ, সাবিত্রীমন্ত্রের দ্রষ্টা, শ্রীরামচন্দ্রের শিক্ষাগুরু ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র দাঁড়াইয়া আমাদিগকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন—"হে আর্য্যবংশধরগণ, তোমরা কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইও না, আমারই মত সংযমমার্গের অনুসরণ কর। দেখ, আমি যে তপস্থাবলে ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে রাজর্ষিত্বে, রাজর্ষিত্ব হইতে ঋষিত্বে, ঋষিত্ব হইতে মহর্ষিত্বে, মহর্ষিত্ব হইতে ব্রহ্মর্ষিত্বে উন্নীত হইয়াছি,

---

* বর্ত্তমান মহাসমরের অবসানে সেই সুসময় আসিবে এরূপ কোন কোন মনীষী বিবেচনা করেন। চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল তখন ইহা নিতান্তই কল্পনার বিষয় ছিল।

তোমরাও সেই তপস্যার আশ্রয় কর। আমি যেরূপ দুর্জ্জয় সাহস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং অপ্রতিহত অধ্যবসায়কে আশ্রয় করিয়া পুরুষকারের শাণিত কৃপাণে দৈবের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছিলাম, তোমরাও সেই দুর্জ্জয় সাহস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অপ্রতিহত অধ্যবসায়কে আশ্রয় কর। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তোমরা বর্ত্তমান ভীষণ জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া এই সিদ্ধর্ষিসেবিত পুণ্যভূমির মুখোজ্জ্বল কর।"

ত্রিবিধ জীবন*

খাইব পরিব সুখে কাল কাটাইব ইহাই সাধারণ মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য। সাধারণতঃ ইহাই অধিকাংশ মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রাণি-মাত্রেই জীবনে সুখ চায়। সেই সুখলাভের প্রত্যাশায় জীবনের কার্য্য যথাসাধ্য নিয়মিত করে। সেই সুখের অন্তরায় যে দুঃখ তাহা দূরে রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। এরূপ জীবন-যাপনে নিন্দার বিষয় কিছুই নাই। যে সব ঘটনা অতীত কালে ঘটিয়াছে, যাহা বর্ত্তমানে চারিদিকে ঘটিতেছে, এবং যাহা ভবিষ্যতে ঘটিতে পারে, তাহার হিসাবনিকাস করিয়া চলাই এই প্রকার জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু তাহাই বা কয়জনে পারে? সেরূপ হিসাবনিকাসের ক্ষমতাই বা কয়জনের আছে? আর হিসাবনিকাসের ক্ষমতা থাকিলেও দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় কয়জন লোকে নিজ নিজ কর্ম্মের ফলাফল গণনা করিয়া কার্য্য করিতে পারে? মানুষ মারিলে ফাঁসি হইবে ইহা জানিয়া শুনিয়া লোকে মানুষ খুন করিতে প্রবৃত্ত হয় কেন? বস্তুতঃ কর্ম্মের ফলাফল গণনা করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে এরূপ সংযতচিত্ত লোকের সংখ্যাও অতি বিরল। তাই যাঁহাদের সেরূপ বিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা আছে, যাঁহারা কর্ম্মের ফলাফল গণনা করিয়া

---

* ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত ১৩১৬ সনের "পূর্ণিমায়" প্রকাশিত প্রবন্ধ।

প্রবৃত্তি দমন করিতে পারেন, তাঁহারা নিন্দার পাত্র না হইয়া বরং প্রশংসার পাত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এরূপ বিচারমূলক জীবনকে life of facts (সংসারগত জীবন) বলা যাইতে পারে, কারণ এরূপ জীবন সংসারের ঘটনা-পরম্পরা বিচারের দ্বারা নিয়মিত। আত্মসুখ লাভই এ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এরূপ জীবনে সুখ ও শান্তি থাকিতে পারে, কিন্তু মহত্ত্ব আছে কি ?

মহত্ত্বের বিকাশ ভাবের উচ্চতায় ও গভীরতায়। হৃদয়ে উচ্চভাব ফুটিয়া উঠিলে, মানুষ নিজের সুখসম্পদ, আপদবিপদ কিছুই গ্রাহ্য করে না। উচ্চ ভাবের উদ্দীপনায় মানুষ ভবিষ্যতের লাভক্ষতি গণনা করিবার অবসর পায় না। সেই ভাবের তরঙ্গে আত্মহারা হইয়া মানুষ সংসারের সুখ-দুঃখে, নিন্দাস্তুতিতে কিছু মাত্র বিচলিত হয় না। এরূপ জীবনকে ভাবময় জীবন (life of ideas) বলা যাইতে পারে।

তোমার আমার মত সংসারসুখমুগ্ধ কত শত ক্ষুদ্র প্রাণী হইতেছে মরিতেছে, হয় ত খুব বিজ্ঞতার সহিত আপন আপন ক্ষুদ্র জীবন নিয়মিত করিয়া বুদ্‌বুদের ন্যায় কালসাগরতলে বিলীন হইতেছে। কিন্তু যে মহাত্মা কোন একটি উচ্চ ভাবে তন্ময় হইয়া তাহাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি যে দেশে যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পুণ্য চিহ্ন ধারণ করিয়া পবিত্র হইয়াছে। ইতিহাস তাঁহার অমরত্ব ঘোষণা করিয়া ধন্য হইয়াছে। এইসকল মহাভাবোন্মত্ত নরনারী

সমগ্র মানব জাতির অক্ষয় সম্পত্তি। যে মহাপুরুষ পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি দধীচি হউন, শাক্যসিংহ হউন বা যীশুখ্রীষ্ট হউন—তিনি সমগ্র মানব জাতির পূজনীয়। যিনি পতিত দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি ম্যাট্‌সিনি হউন, ওয়াসিংটন হউন, প্রতাপসিংহ হউন—সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে তাঁহার বিজয় ঘোষণা করিবে। যিনি পতিত ধর্ম্মকে উদ্ধার করিবার জন্য জীবনউৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ হউন, শঙ্করাচার্য্য হউন, মার্টিন লুথার হউন—ধর্ম্মজগতে চিরদিন তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

এই সকল মহাত্মা মানবজাতির ইতিহাস-পৃষ্ঠে উচ্চতম ভূধর শিখরের ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু উচ্চতম গিরিশৃঙ্গের আবার ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা স্তর আছে। ভাবরাজ্যও সেইরূপ নানা স্তরে বিভক্ত। যে সকল নরনারী ভাবরাজ্যের ক্ষুদ্র স্তরে সাধনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পুণ্য-কীর্ত্তিও চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রদেশে এরূপ ভাবের পাগল নরনারীর সংখ্যা খুব অধিক। কেহ বা দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদসাধনমানসে জীবন পণ করিয়া গিয়াছেন। কেহ বা কারারুদ্ধ কয়েদীদিগের সুখসুবিধার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। কেহ বা বর্ব্বর সমাজে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য জীবন পাত করিয়াছেন। কেহ বা নূতন দেশ বা নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য জীবন সমর্পণ করিতেছেন। কত মহিলা যুদ্ধে

আহত বা রোগশয্যায় শায়িত নরনারীর সেবার জন্য জীবন দান করিতেছেন। আর স্বদেশের বা স্বজাতির হিতের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত নহেন, এরূপ নরনারীর সংখ্যা ইয়ুরোপ, আমেরিকা বা জাপানে নাই বলিলেই চলে।*

এক সময়ে আমাদের এই অধঃপতিত ভারতবর্ষেও এরূপ ভাবের পাগল নরনারীর সংখ্যা কম ছিল না। তাঁহাদের পুণ্য-বলেই এক সময়ে এদেশ উঠিয়াছিল, আবার তাঁহাদের অভাবেই এদেশ এখন এত হীন হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুজাতির প্রকৃতিগত বিশেষত্বের জন্য প্রধানতঃ ধর্ম্মের দিক দিয়াই তাঁহাদের হৃদয়ের ভাবগুলি ফুটিয়াছিল, স্বদেশ বা স্বজাতির অবলম্বনে ফোটে নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইয়ুরোপ, আমেরিকা বা জাপান যেরূপ স্বদেশের ভাবে উন্মত্ত হইয়াছে, সেইরূপ এক সময়ে ধর্ম্মরূপ মন্দাকিনী ধারার উচ্ছ্বাসে এদেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। সেই সকল ধর্ম্মের ভাব কেবল যে আত্ম-যোগ-সাধনে বা ঈশ্বরের আরাধনায় নিবদ্ধ ছিল তাহা নহে। তাহা লোকের সামাজিক জীবনেও নানা ভাবে ফুটিয়া উঠিত। কারণ হিন্দুজাতির সমাজ ধর্ম্মের জন্য ছিল, ধর্ম্ম সমাজের জন্য ছিল না; তাঁহাদের সামাজিক কর্ত্তব্যগুলিও ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে সাধিত হইত।

কায়মনোবাক্যে গুরুর আদেশ প্রতিপালন করা শিক্ষার্থী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে শিষ্যের বিদ্যালাভ হয় না। এই নিজ-হিতমূলক কর্ত্তব্যটিকে আমরা একালের লোকে

---

* বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় মহাসমর ইহার জাজ্জ্যমান প্রমাণ।

অন্যান্য কত শত সামাজিক কর্ত্তব্যের ন্যায় কেবল সামাজিক কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝি। তাই স্কুলকলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে গুরুর আদেশ প্রতিপালন করাটা, গণিত বা বিজ্ঞান পাঠের ন্যায় একটি ইচ্ছাধীন বিষয় (optional subject) বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু সেকালের কোন কোন শিষ্য এমন পাগল ছিল যে এই ক্ষুদ্র সামাজিক কর্ত্তব্য পালনের অনুরোধে জীবন বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত ছিল! তাই আমরা দেখি, ধৌম্য-শিষ্য উদ্দালক গুরুর ক্ষেত্রে জল রক্ষা করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া (কেবল পড়া মুখস্থ করিবার জন্য নহে!) নিজে আলের উপর শুইয়া রাত্রি কাটাইয়াছিলেন, কারণ গুরুর আদেশ অবশ্য পালন করিতে হইবে। আবার সেই গুরুর আর একটি শিষ্য উপমন্যু গুরুর আদেশে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল হৃষ্টচিত্তে গুরুকে অর্পণ করিয়া—এমন কি গরু চরাইতে গিয়া গরুর দুগ্ধ, ও পরে দুগ্ধপায়ী বৎসের মুখের ফেন পর্য্যন্ত খাইতে নিষিদ্ধ হইয়া—অবশেষে ক্ষুধার জ্বালায় অর্কপত্র ভক্ষণ করিয়া অন্ধ হইয়াছিলেন।

বিপন্ন ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করা একটি সামাজিক কর্ত্তব্য। ইহার মূলে নিজের স্বার্থপরতা অর্থাৎ "তুমি তোমার প্রতিবেশীর নিকট যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তুমিও তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর"—এই নীতি বিদ্যমান। এই হিসাবে বর্ত্তমান সময়ে অন্যকে আশ্রয় দেওয়া নিজের ইচ্ছাধীন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি যখন কখনও তোমার দ্বারস্থ হইব না, তখন তোমাকে আশ্রয় দিতে আমার গরজ কিসের? বিশেষতঃ তোমাকে আশ্রয় দিয়া

যদি আমার নিজকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়, তখন তোমাকে আমার বাড়ীর কাছে আসিতে দেওয়াই অন্যায়। অতএব হে আশ্রয়প্রার্থী বিপন্ন ব্যক্তি! তুমি দূর হও। এখনকার দিনে আমাদের এই হিসাব। কিন্তু পূর্ব্বকালে এদেশে এমন লোকও ছিলেন, যাঁহারা এই কর্ত্তব্যটিকে একটি পরম ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতেন এবং শরণাগতের রক্ষার্থে নিজের যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাই আমরা দেখিতে পাই, মহারাজচক্রবর্ত্তী শিবি একটি ক্ষুদ্র কপোত পক্ষীকে শ্যেনের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য অবলীলাক্রমে নিজের শরীর হইতে মাংসখণ্ড কর্ত্তন করিয়া দিতেছেন!

এই প্রসঙ্গে একটি রমণীরত্নের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি যে সে রমণী নহেন—তিনি বাসুদেবের ভগিনী, অর্জ্জুনের সহধর্ম্মিণী, অভিমন্যুর গর্ভধারিণী, পাণ্ডব-কুল-লক্ষ্মী সুভদ্রা। মহারাজ দণ্ডী একটি ঘোটকীর জন্য কৃষ্ণভয়ে ভীত হইয়া সুভদ্রার শরণাপন্ন হইলেন। সুভদ্রা তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। তাহার ফলে স্বয়ং কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণের ভীষণ সমর বাধিয়া উঠিল। স্বর্গের দেবগণ, মর্ত্ত্যের প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গ সেই যুদ্ধে যোগদান করিলেন। পাণ্ডবদিগের সমূহ বিপদ উপস্থিত। তবুও সেই মনস্বিনী রমণী সুভদ্রাদেবী দণ্ডীকে পরিত্যাগ করিলেন না। পাণ্ডবগণও এই ঘোর বিপদে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সত্যের জয় হউক, ধর্ম্মের জয় হউক—ইহাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। তুমি সহোদর ভ্রাতা, তুমি

প্রাণপ্রতিম সখা, তুমি ভবসাগরের কাণ্ডারী স্বয়ং ভগবান্—আমার কর্ত্তব্য পালনের জন্য তোমাকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারি! বোধ হয়, ইহাই শিক্ষা দেওয়ার জন্য লীলাময়ের এই বিচিত্র লীলা। উভয় পক্ষে যুদ্ধের বিরাট আয়োজন হইল, কিন্তু যুদ্ধ হইল না। স্বর্গমর্ত্ত্যের "অষ্টবজ্র" যেই মিলিত হইল, অমনি সেই অপূর্ব্ব ঘোটকী শাপমুক্ত হইয়া অপ্সরারূপ ধারণ করিয়া স্বর্গে গেল।

শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়ার ন্যায় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাও একটি সামাজিক কর্ত্তব্য। একবার যে কথা মুখ দিয়া বলিয়া ফেলিয়াছি, তাহা রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। কারণ তাহা রক্ষা না করিলে, আর কেহ আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে না, সুতরাং তাহাতে আমারই ক্ষতি। সেই ক্ষতি নিবারণ করিবার জন্য আমার নিজের অঙ্গীকার পালন করা আবশ্যক। কিন্তু সেই অঙ্গীকার পালন করিতে গিয়া যদি আমাকে অন্য প্রকারে অধিকতর ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, তবে আমি তাহা কেন পালন করিব? মুখ দিয়া হঠাৎ কথাটা বাহির করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া কি, তাহা একেবারে বেদবাক্যের মত অটল হইবে? অন্ততঃ এখনকার দিনে আমরা ত অঙ্গীকারপালনে এই ভাবে দেখি। বিশেষতঃ রাজনীতি ক্ষেত্রে। কিন্তু এক সময়ে এদেশের লোক অঙ্গীকারপালনকে জীবনের এক মহাব্রত বলিয়া বুঝিতেন, তাই তাঁহারা সংসারের সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ ইহার কাছে অতি তুচ্ছ বলিয়া গণ্য করিতেন। তাই আমরা দেখিতে পাই, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের নিকট একটি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে

যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না—সেই কঠোরপ্রাণ ঋষির পরিতোষের নিমিত্ত নিজের স্ত্রী পুত্র বিক্রয় করিয়া, অবশেষে নিজে চণ্ডালের দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন! এইরূপে রাজর্ষি দশরথ কৈকেয়ীর নিকট কথন কোন সূত্রে দুইটি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাই স্মরণ করিয়া আপনার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেকের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে প্রেরণ করিয়া নিজেও পুত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন!

শ্রীরামচন্দ্রও আদর্শ পুত্র। পিতার ধর্ম্ম রক্ষা করা সন্তানের একমাত্র কর্ত্তব্য। পিতা মৃত হইলেও সন্তানকে সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইবে। অবশ্য এখনকার দিনে আমরা পিতা জীবিত থাকিতেও তাঁহার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে তাঁহারই উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকি, মরিলে ত কথাই নাই। আর পিতার আজ্ঞা পালন করি কতক্ষণ? না যতক্ষণ আমাদের নিজেদের তাহাতে কোন অসুবিধা না ঘটে। কিন্তু রামচন্দ্র সেই পিতৃসত্য পালন এবং পিতার ধর্ম্মরক্ষাকে জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। তাই আদর্শ ভ্রাতা ভরত আসিয়া সজলনয়নে তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া যখন তাঁহাকে অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়া রাজ্য গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন, তখন তিনি কিছুতেই সম্মত না হইয়া বনবাসী হইলেম। তিনি অবশ্য জানিতেন, তিনি অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলে তাঁহার স্বর্গীয় পিতাই অধিকতর তৃপ্তিলাভ করিতেন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ রামচন্দ্র

পিতার ধর্ম্মকে পিতার সন্তোষ অপেক্ষাও অধিক জ্ঞান করিয়াছিলেন, এবং সেই ধর্ম্মের জন্য রাজরাজেশ্বর হইয়াও বনবাসী হইলেন।

আর সেই ভরত? ইনিও আর একটি প্রথম নম্বরের পাগল! আজ কালকার দিনে এক সহোদর ভ্রাতা সামান্য সম্পত্তির জন্য অন্যের গলায় ছুরি দিতেছে—রাজ্যের জন্য ত কথাই নাই। রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন না, তখন ভরত যদি পিতার আদেশে রাজ্য গ্রহণ করিতেন, তবে কে তাঁহার নিন্দা করিত? কিন্তু সেই সহোদরের অধিক ভ্রাতৃবৎসল, ভ্রাতৃভাবোন্মত্ত ভরত অযোধ্যার সিংহাসন তৃণবৎ পরিত্যাগ করিলেন এবং রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে বসাইয়া, রামের প্রতিনিধি-স্বরূপ, রামের প্রত্যাবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত, সন্ন্যাসীর বেশে রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভরত কি তোমার আমার মত মানুষ?

রামচন্দ্র কেবল আদর্শ পুত্র নহেন, তিনি আদর্শ রাজা। প্রজারঞ্জন করা রাজার একমাত্র কর্ত্তব্য। রাজা আছেন কেন? না প্রজার হিতের জন্য। ইহাই রাজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এদেশের প্রাচীন মত। অনেক মারামারি কাটাকাটির পর বর্ত্তমান সময়ে নানাদেশে এই ডিমোক্রেটিক্ ভাবের অভ্যুদয় দেখা যাইতেছে। তাই এখন নানাদেশে প্রজাতন্ত্র-শাসন (Representative Government) এর উৎপত্তি হইতেছে। কিন্তু ভারতের পক্ষে ইহা, নূতন জিনিষ নহে। আর ভারতে রাজার কর্ত্তব্য শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, এরূপ কোন দেশে কোন কালে কোন

রাজা বুঝিবেন কি না জানি না। তাই আমরা দেখিতে পাই, যে সীতার শোকে অধীর হইয়া রামচন্দ্র একদিন সুগ্রীবের সাহায্য-লাভার্থে অন্যায় সমরে বালিবধ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, যাঁহার উদ্ধারের জন্য সমুদ্রে সেতু বাঁধিয়াছিলেন, সবংশে রাবণ বধ করিয়াছিলেন, লঙ্কাপুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন,—সেই প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা সতী সাধ্বী পত্নীকে নিতান্ত অর্ব্বাচীন প্রজার মনস্তুষ্টির জন্য আসন্ন-প্রসবাবস্থায় অবলীলাক্রমে বনবাসে প্রেরণ করিলেন! এস্থলে রামের পতিধর্ম্ম রাজধর্ম্মের নিকট ম্লান হইয়াছে। সীতাপতি রাম নরপতি রামের ছায়ায় ঢাকা পড়িয়াছেন। সম্ভবতঃ এক জীবনে এক জনের দ্বারা সর্ব্ব প্রকার আদর্শ রক্ষা করা অসম্ভব, এই সত্য এখানে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কিন্তু রাজোচিত কর্ত্তব্যরূপ-মহাভাবোন্মত্ত রাম এই কার্য্য দ্বারা যে চিরদিনের জন্য প্রজার হৃদয়-সিংহাসনে বিরাজ করিবেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এবার সেই আদর্শ সতী সীতার কথা বলিব। রাবণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া অশোকবনে রাখিয়াছে। তিনি সেই অশোকবনের পরমরমণীয় পত্র-পুষ্প-শোভা একবারও দেখিতেছেন না। তিনি প্রবালময় সোপান ও সুবর্ণময় বেদিকা-শোভিত অম্বরচুম্বী অট্টালিকা সকল তুচ্ছ করিয়া একটি বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেছেন। রাবণ তাঁহাকে যে সকল বহুমূল্য বস্ত্রাভরণ অর্পণ করিয়াছিল, তাহার প্রতি ভুলক্রমেও দৃক্‌পাত না করিয়া নিজের একমাত্র ক্লিষ্ট কৌষেয়-বসন পরিধান করিয়া,

উপবাসে শোকে ভয়ে কৃশা হইয়া পতিকে ধ্যান করিতে করিতে ধূমজ্বালাবৃত বহ্নিশিখার ন্যায় অথবা পঙ্কদিগ্ধ মৃণালিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। রাবণ আসিয়া তাঁহাকে অনেক প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া অনুনয় বিনয় করিল; তদুত্তরে তিনি তাহাকে নানা প্রকার তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন। অবশেষে রাবণ বলিয়া গেল—"আমি তোমাকে আর দুই মাস সময় দিতেছি; ইহার মধ্যে তুমি আমার বাধ্য না হইলে আমার প্রাতরাশের নিমিত্ত পাচকগণ তোমার শরীর খণ্ড খণ্ড করিবে।" সীতা নিরুপায় হইয়া বিলাপ করিতে করিতে উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। ঠিক এই সময়ে তাঁহার দুঃখের অমানিশা ভেদ করিয়া একটি ক্ষীণ আশার আলোক ফুটিয়া উঠিল। রামের চর হনুমান শিংশপা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সীতার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং রামের অভিজ্ঞান প্রদর্শন দ্বারা সীতার সন্দেহ ও ভয় দূর করিলেন। হনুমান্ তাঁহাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য নিজের পৃষ্ঠে তুলিয়া শ্রীরামের নিকট লইয়া যাইতে চাহিলেন, এবং সীতার প্রত্যয়ের জন্য নিজের বিরাট বপুঃ দেখাইলেন। এরূপ অবস্থায় অন্য কোন রমণী হইলে কি করিতেন? এইরূপ আসন্ন বিপদ হইতে যত শীঘ্র উদ্ধার পাওয়া যায় ততই মঙ্গল। এই দুই মাসের মধ্যে রাম যে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় আসিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা কি? আবার লঙ্কায় আসিতে পারিলেও এই দুই মাসের মধ্যে রাবণকে বধ করিয়া সীতার উদ্ধার সাধন করিতে পারিবেন তাহারই বা

নিশ্চয়তা কি ? সুতরাং অন্য কোন রমণী রামের আগমন অপেক্ষা না করিয়া, হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সহিত অনায়াসে মিলিত হইতে ইচ্ছা করিতেন। শত্রুগৃহ হইতে এরূপ ভাবে পলায়ন করা কি দোষাবহ ? আমাদের মতে নহে কিন্তু আদর্শ সতী জানকী এরূপ পলায়নে সম্মত হইলেন না আদর্শ সতী কি ইচ্ছাপূর্ব্বক পরপুরুষ স্পর্শ করিতে পারেন ? কখনই না। আবার রাবণ যেন তাঁহাকে তস্করের ন্যায় হরণ করিয়া আনিয়াছিল, তাই বলিয়া তিনি রঘুকুলবধূ কিরূপে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিবেন ? এরূপভাবে পলায়ন করিলে তাঁহার স্বামী সেই রঘুকুলতিলকের বীরত্বে কলঙ্ক স্পর্শিবে। তাই তিনি হনুমানকে বলিলেন—"হে হনুমান্, আমি তোমার সাধু ইচ্ছা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আমার জীবন যায় সেও ভাল, তবু আমি ইচ্ছা করিয়া পরপুরুষ স্পর্শ করিতে পারিব না। আর রাম যদি দশাননকে বধ করিয়া আমাকে উদ্ধার করিতে পারেন, তবেই তাঁহার উপযুক্ত কার্য্য হইবে।"

"যদি রামো দশগ্রীবমিহ হত্বা স রাক্ষসম্।
মামিতো গৃহ্য গচ্ছেত তৎ তস্য সদৃশং ভবেৎ ॥"

অর্থাৎ সীতার নিকট পতিলাভ অপেক্ষাও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বড় ! নিজের প্রাণ যায় সেও ভাল তবু বীর পতির যশোরাশিতে কলঙ্ক স্পর্শ না হয়। ধন্য সতী-শিরোমণি ! ধন্য বীরপত্নী !

যদি এই একটি সতী চরিত্র দেখিলেন, তবে আর একটি দেখুন। মহারাজ অশ্বপতির একমাত্র দুহিতা সাবিত্রী। এই

কন্যারত্নকে তিনি অনেক তপস্যার ফলে লাভ করিয়াছেন, সুতরাং সাবিত্রী তাঁহার বড়ই আদরের বস্তু। অশ্বপতি উপযুক্ত বরের অভাবে তাঁহার বিবাহ দিতে পারিতেছেন না, কারণ তাঁহার মধ্যে এরূপ একটি তেজ ছিল যাহা কোন পরিণয়ার্থী যুবক সহ্য করিতে পারিলেন না। অবশেষে মহারাজ সাবিত্রীকে নিজের বর পছন্দ করিতে আদেশ করিলেন। সাবিত্রী দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে দেখিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণে অশ্বপতি জানিতে পারিলেন, সত্যবান্ স্বল্পায়ুঃ। সেইজন্য মহারাজ অশ্বপতি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সাবিত্রীকে অন্য পতি বরণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। সাবিত্রী সত্যবান্‌কে মনে মনে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সত্যবানের ত বিবাহ হয় নাই? তবে আর সাবিত্রীর অন্য পতি বরণে বাধা কি হইতে পারে? বর্ত্তমান সময়ে আমরা ত ইহাতে কোন দোষ দেখি না। বিশেষতঃ সুসভ্য পাশ্চাত্য সমাজে এরূপ মনে মনে পতি বরণ করিয়া তাহার চিত্র আবার মন হইতে মুছিয়া ফেলা ত নিত্য ঘটনা। তাহাদের দেখাদেখি আমাদের দেশেও এরূপ পতিবরণ কিছুদিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুনারীর আদর্শরূপা সাবিত্রী মাতা অন্যরূপ বুঝিলেন। সেই আদর্শ সতীর হৃদয়-মুকুরে যে পতির চিত্র একবার প্রতিফলিত হইয়াছে, সেখানে অন্য মূর্ত্তি কি প্রকারে স্থান পাইবে? তাই তিনি পিতাকে বলিলেন, "সত্যবান্ দীর্ঘায়ুঃ হউন বা স্বল্পায়ুঃ হউন—সগুণ হউন বা নির্গুণ হউন, আমি যখন তাঁহাকে একবার পতি বলিয়া

মনে মনে বরণ করিয়াছি, তখন এ জীবনে অন্য পতি গ্রহণ করিব না।”

আর দৃষ্টান্ত বাড়াইব না। এই সকল ভাবকে এখনকার লোকে কি বলিবে? বাতুলতা না Sentimentalism? এখনকার লোকে যাহাই বলুক, এই সব ভাবই খাঁটি আর্য্যভাব। এই সব ভাব খাঁটি ভারতবর্ষের জিনিষ। এক সময়ে ভারতবর্ষে এই সকল মহাভাবের সাধনা হইত। সেই সাধনায় যে সকল মহাত্মা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম পুরাণেতিহাস সগর্ব্বে বহন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রবল কলির প্রভাবে এখন সে সাধনা লুপ্ত হইয়াছে। এখন আর সে আর্য্যগণ-সেবিত পুণ্যনিকেতন ভারতবর্ষকে চিনিবার উপায় নাই। কেবল একটি মাত্র ভাব অতীতের সহিত বর্ত্তমানের কথঞ্চিৎ যোগ রাখিয়াছে। সেটি হইতেছে হিন্দুনারীর পাতিব্রত্য। সীতা সাবিত্রীর পুণ্যবলে এখনও এদেশে সতী নারীর অভাব হয় নাই। হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য্য তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ইংরেজের আইনবলে সতীদাহ নিষিদ্ধ হইলেও, এখনও মধ্যে মধ্যে দুই একটি সতী রমণীকে অতি আশ্চর্য্যরূপে মৃতপতির অনুগমন করিতে শুনা গিয়া থাকে। কিন্তু দুর্জ্জয় কালের প্রভাবে হিন্দুজাতির এই শেষ গৌরবটুকু—ভারতের এই শেষ মহিমাটুকুও বুঝি আর থাকে না। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক সকল বিষয়েই বিলাতির অনুকরণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, কারণ তাঁহাদের মতে এই বিলাতির অনুকরণই চরম উন্নতি। এতদিন

কেবল 'অনুকরণ' ছিল, এখন স্বদেশী হুজুকে আবার 'অনুবাদ' আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা স্বদেশীর খাতিরে বিলাতী ভাবের 'অনুকরণ' করিতে লজ্জা বোধ করেন, তাঁহারা তাহার 'অনুবাদ' করিয়া লইতেছেন। কিন্তু কেবল অনুকরণ এবং অনুবাদ দ্বারা যেমন জাতীয় সাহিত্য গঠিত হইতে পারে না, সেইরূপ কেবল বিদেশীয় ভাবের অনুকরণ এবং অনুবাদ দ্বারাও জাতীয় জীবন গঠিত হইতে পারে না। যেমন স্থায়িসাহিত্যের জীবন মৌলিকতা, সেইরূপ স্থায়ী জাতীয় জীবনের মূলেও মৌলিকতা। যে জাতির যে টুকু বিশেষত্ব তাহা বর্জ্জন করিলে, কোন্ ভিত্তির উপরে জাতি গঠন করিবে? সেই বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া, তাহার অবলম্বনে জাতীয় অট্টালিকা নির্ম্মাণ কর, এবং যদি তাহার উপর বিলাতী রঙ্, বিলাতী চাকচক্য ফলাইতে চাও তবে ফলাইতে পার। তাহা হইলে জাতি গঠন স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য হইবে। তাহা হইলে সেই জাতীয় সৌধের ভিত্তি সমাজের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে। এই যে কিছুদিন পূর্ব্বে স্বদেশী ভাবের উচ্ছ্বাসে—স্বদেশপ্রীতির বন্যায় সমগ্র দেশ প্লাবিত হইয়াছিল, এখন সেই ভাবের বিন্দু কোথায়ও কিছু আছে কি? হাঁ, আছে বৈ কি। গভীর খাতেই বন্যার জল দাঁড়ায়, উচ্চ ভূমি হইতে তাহা সরিয়া যায়। যে সকল মহাত্মার হৃদয়ে ঈশ্বরভক্তি, গুরুজনভক্তি, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি উচ্চভাব সকলের গভীরতা আছে, সেইখানেই এই স্বদেশপ্রীতির বন্যার জলও দাঁড়াইয়াছে, অন্য হৃদয়ে যত শীঘ্র আসিয়াছিল তত শীঘ্র সেখান হইতে সরিয়া

গিয়াছে। সুতরাং এই সকল জাতীয় ভাবই আমাদের জাতি গঠনের ভিত্তি হউক। বিশেষতঃ ধর্ম্ম জিনিষটি এদেশবাসী নরনারীর মজ্জাগত উচ্চভাব। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া যাহারা নেশন গঠন করিতে প্রয়াস পাইবেন, তাঁহাদের চেষ্টা কথনও এদেশে সফল হইবে না। ধর্ম্মবিচ্যুত জাতীয়তা বরং অনেক উপসর্গের উৎপাদন করিবে।* যদি বল, এদেশে নানা ধর্ম্মের নানাজাতির বাস—ইহাতে "মহাজাতি" গঠন কি প্রকারে হইবে? মহাজাতি গঠনের প্রস্তাবটা আপাততঃ কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখিলেই ভাল হয়। আগে জাতি, না আগে মহাজাতি? আগে ব্যক্তি না আগে জাতি? মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন এখন এদেশে আকাশ-কুসুম ও মায়ামরীচিকাবৎ অলীক। সেই মায়ামরীচিকার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার জাতিত্ব নষ্ট করিও না।

কথায় কথায় আমরা প্রস্তাবিত বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন সেই মূল প্রস্তাবের অনুসরণ করা যা'ক। ত্রিবিধ জীবনের মধ্যে আমরা সংসারগত জীবন (Life of facts) ও ভাবময় জীবন (Life of ideas) দেখিয়াছি। এই দুই প্রকার জীবন ভিন্ন আর এক প্রকার জীবন আছে। তাহার নাম "Ideal life" অর্থাৎ আদর্শ জীবন।

ভাবময় জীবনের (life of ideas) কিরূপ মহত্ব তাহার

* জাতীয়তার মূলে ধর্ম্মের যোগ না থাকাতেই অবশেষে স্বদেশী ডাকাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ভাবের উচ্ছ্বাস সকল-ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় নহে। সেই উচ্ছ্বাসের মূলে পরহিতৈষণা বা অন্য কোন ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্মেষ না থাকিলে, তাহার মহত্ত্ব স্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্য জগতে বর্ত্তমান সময়ে অনেক লোক শুধু খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া নানা দুঃসাহসের কাজ করিতেছে। কেহ সাঁতার কাটিয়া ইংলিস্ চেন্যাল পার হইতেছে, কেহ পদব্রজে বা বাইসিকেলে চড়িয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে—ইত্যাদি। আমাদের দেশেও কোন কোন স্থলে দেখিতে পাই, মামলা মোকর্দ্দমার জেদ রক্ষা করিতে গিয়া কত লোকে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। আবার এমন কত ভাবোন্মত্ত ব্যক্তি দেখা যায়, যাঁহারা পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধে ক্ষণস্থায়ী যশঃ লাভ করিবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইতেছেন এবং সেই ঋণ শোধের জন্য যাবজ্জীবন কষ্টভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের এই কষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের পরলোকগত পিতামাতার তৃপ্তি হয় কি না বলিতে পারি না, তবে এরূপ কার্য্য যে পরিণামদর্শী সুধীজনের নিকট নিন্দনীয় সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালেও লোকে এইরূপ ভাবের উচ্ছ্বাসে অনেক অকার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তখন ধর্ম্মের একাধিপত্য ছিল বলিয়া এই সব খেয়াল ধর্ম্মের বেশ ধারণ করিয়া লোকের মন ভুলাইত। কিন্তু খেয়ালের বশে আত্মত্যাগ কখনও ধর্ম্মপদবাচ্য হইতে পারে না। ইহার সাক্ষী মহারাজ বলী। তাঁহাকে এইরূপ অসংযত ভাবের উচ্ছ্বাসে পড়িয়া বামনরূপী বিষ্ণুকে পৃথিবীদান করিয়া পাতালে বন্দী

হইতে হইয়াছিল। অতিদানরূপ খেয়ালের ইহাই ভগবৎ-প্রদত্ত শাস্তি। অন্যের কথা দূরে থাকুক, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও এইরূপ একটি অধর্ম্মমূলক খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। দ্যূতক্রীড়া একটি ব্যসন সুতরাং ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ক্রূরমতি দুর্য্যোধন যখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন, তখন ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রভাবে অনায়াসেই ত সেই আহ্বান প্রত্যা-খ্যান করিতে পারিতেন। কিন্তু এই পাপ ব্যসন তখন তাঁহার নিকটে ধর্ম্মের মুখস পরিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাই তিনি বিদুরকে বলিলেন "যদি আমাকে সভা মধ্যে আহ্বান না করিত, তাহা হইলে আমি শকুনির সহিত ক্রীড়া করিতাম না।* যখন আহূত হইয়াছি, তখন নিবৃত্ত হইব না, ইহাই আমার সনাতন ব্রত।*" সেই সনাতন ব্রত রক্ষার ফল হইল রাজ্যনাশ, দাসত্ব স্বীকার, দ্রৌপদীর অবমাননা এবং বনবাস। ধর্ম্মবেশধারী পাপ এইরূপে সাধুজনকেও প্রতারিত করে।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, সকল ভাবের উদ্দীপনাই কল্যাণ-কর নহে। এমন কি উচ্চভাব সকলও অতিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে পাপজনক হয়। কারণ তাহা সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী। যাহা সৎ, যাহা সত্য, যাহা স্থায়ী মঙ্গল উৎপাদন করে, তাহাই সনাতন ধর্ম্ম। এই সনাতন ধর্ম্মই সকল প্রকার ভাবের কষ্টিপাথর। ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায়ও যদি উচ্চভাব স্থায়ী মঙ্গলের সীমা অতিক্রম

---

* কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত হইতে উদ্ধৃত।

করে, তবে তাহা অধর্ম্মে পরিণত হয়, সুতরাং তাহাকে সংযত করা উচিত। উচ্চভাব সকলকে এই সনাতন ধর্ম্মের আলোকে সুসংযত করিতে হইবে। যে মহাত্মার হৃদয়ে ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রসূত উচ্চভাব সকলের উদ্দীপনা হয়, অথচ সেগুলি এই সনাতন ধর্ম্মের আলোকে সুসংযত,—যে মহাপুরুষের হৃদয়-ক্ষেত্র সর্ব্ব প্রকার উচ্চ-ভাবের আকর অথচ তাহার কোন একটি অতিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অন্যগুলিকে হ্রাস করিয়া অমঙ্গল উৎপাদন করে না—যাঁহার চরিত্রে উচ্চতম ধর্ম্মভাব সকলের সুসংযত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়—তিনিই আদর্শ পুরুষ, তাঁহার জীবনই আদর্শ জীবন (Ideal life)।

কিন্তু এরূপ উচ্চতম আদর্শ মানবজীবনে সম্ভবে না, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরই তাহার প্রমাণ। তাই স্বয়ং ভগবান কখন কখন লোক-শিক্ষার জন্য আদর্শ জীবন গ্রহণ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। নচেৎ ক্ষুদ্র মানব কি দেখিয়া কোন্ অবলম্বনে উর্দ্ধে উঠিবে? তাই স্বয়ং করুণাময় কখনও পূর্ণরূপে, কখনও অংশ কলায় অবতীর্ণ হইয়া এই ধরাধাম পবিত্র করেন। তাই তিনি কখনও আদর্শ গৃহী, কখনও আদর্শ সন্ন্যাসী, কখনও আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ পতি, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ সখা—আবার কখনও বা আদর্শ মাতা, আদর্শ দুহিতা, আদর্শ সহধর্ম্মিণী। তিনিই আদর্শ প্রেমিক, তিনিই আদর্শ প্রেমিকা। তিনিই আদর্শ প্রজা আবার আদর্শ রাজা। সেই এক হইয়াও বহু—সেই বহুরূপী অনন্তরূপী পুরুষের পদে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

জাতীয়তা ও বিশ্ব-মানবতা।

সংপ্রতি একটা হুজুক উঠিয়াছে—বিশ্বমানবতা। শ্রুতিতে 'বিশ্বদেব' কথার উল্লেখ আছে। এস্থলে "বিশ্ব" অর্থে সমস্ত, যথা—"মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে" অর্থাৎ দেবতারা সকলে সেই বিশ্বরূপী ব্রহ্মের উপাসনা করেন। এই বিশ্বদেব কথার অনুকরণে বিশ্বমানব কথার সৃষ্টি, আবার ইহার ভাবার্থ ইংরেজী Humanity শব্দের অর্থ হইতে গৃহীত। তিন নকলে আসল খাস্তা হয়, দুই নকলেও কতকটা সেইরূপ। আমাদের বর্ত্তমান সময়ের কোন কোন মনীষী এই Humanityর নকল করিতে গিয়া আসল খাস্তা করিতে বসিয়াছেন। আমরাও তাঁহাদের কথা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া হাত তালি দিতেছি। তাঁহারা বলেন, ভারতের জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া বিশ্বমানবের সহিত এক হও। এসব কথা শুনিতে খুব চমৎকার, এসব ideaও খুব liberal ; কিন্তু ইহার মানে একবার তলাইয়া দেখা উচিত। ইহার অর্থ, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত সপিণ্ডীকরণ উদ্দেশ্যে আমাদের জাতীয় জীবনের বিনাশ—হিন্দু জাতির অপমৃত্যু বা আত্মহত্যা। সকলেই জানেন, কোন মৃত ব্যক্তির পুত্র তাহার পিতাকে পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত মিলাইয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার সপিণ্ডীকরণ করিয়া থাকেন। আমাদের বিশ্বমানবতার ঋষিগণ সেইরূপ হিন্দুজাতিকে তাহার জাতীয় পৃথক অস্তিত্ব ডুবাইয়া

দিয়া বিশ্বমানবের সহিত এক হইতে বলিতেছেন। কিন্তু তাহা কি কখনও সম্ভব? ধরিলাম, হিন্দু জাতি এই সকল মনীষীর উপদেশে জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া ইংরেজ, ফরাসী, জাপানী, আমেরিকানের সহিত আহার বিহার, আচার ব্যবহার, আদান প্রদানে এক হইয়া গেল। কিন্তু তাহার ফল কি হইবে? তখন যে মিশ্র জাতি উৎপন্ন হইবে তাহাকে হিন্দু জাতি বলিয়া কেহ চিনিবে কি? তখন হয় ত নামে সে জাতি হিন্দু থাকিতে পারে; যেমন এখন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতবাসী মাত্রেই হিন্দু বলিয়া পরিচিত। কিন্তু যে জাতীয় বিশেষত্ব এখন হিন্দুজাতিকে অন্য জাতি হইতে পৃথক্ করিতেছে, তখন তাহার কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকিবে না। তখন যে সকল উচ্চতম আদর্শ বক্ষে ধারণ করিয়া হিন্দুজাতি এতদিন জীবিত রহিয়াছে, তাহা লুপ্ত হইবে। তখন হিন্দুজাতির যুগযুগান্তব্যাপী তপস্যার ফল বেদ পুরাণ শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র রামায়ণ মহাভারত ভাগবতের সঙ্গে তাহার জীবনের সম্বন্ধ-সূত্র ছিন্ন হইবে। তখন মনু যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস বাল্মীকি, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ অষ্টাবক্র প্রভৃতি শত শত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী ঋষির যে পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিয়া হিন্দুজাতি বাঁচিয়া আছে, তাহা বিলুপ্ত হইবে। তখন রামলক্ষ্মণ, কৃষ্ণার্জ্জুন, ভীমযুধিষ্ঠির, কর্ণদ্রোণ প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক, শৌর্য্য-বীর্য্য-মনুষ্যত্বের জলন্ত আদর্শ নরদেবগণের চরিত্রমহিমা সকলে ভুলিয়া যাইবে। তখন সীতাসাবিত্রী দ্রৌপদীদময়ন্তী শৈব্যাশকুন্তলা প্রভৃতি পতিব্রতা আর্য্যরমণীগণের যে পুণ্য-স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ

করিয়া হিন্দুরমণীগণ তাঁহাদের সতী-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে কেহ চিনিবে না। তখন অযোধ্যা মথুরা কাশী কাঞ্চী পুরী দ্বারাবতী প্রভৃতি ভারতের তীর্থসমূহ, গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদা সিন্ধু প্রভৃতি পুণ্যতোয়া নদীসকল, যাঁহাদের নাম স্মরণ করিলে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রত্যেক হিন্দুর মনে পবিত্র পুলক সঞ্চার হয়, তাঁহাদের মাহাত্ম্য সকলে বিস্মৃত হইবে। তখন শিব বিষ্ণু কালী দুর্গা রাধাকৃষ্ণ হরি রাম প্রভৃতি সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ বিপদুদ্ধারণ দেবদেবীর নাম, যাহা স্মরণ করিতে করিতে এখনও কত ভক্তের নয়নে প্রেমাশ্রু বিগলিত হয়, তাহা সকলে ভুলিয়া যাইবে। তখন দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুরাদি ভাব, পূজা জপ ধ্যান ধারণাদি সাধন, ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম প্রভৃতি যোগ, যাহা শত শত বৎসর হিন্দুর জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়া ঈশ্বরপ্রাপ্তির সহায় হইয়াছে, তাহা—"নৈবেদ্য" "পঞ্চপ্রদীপ" "হোমশিখা" "যজ্ঞভস্ম" "তীর্থ-সলিল" প্রভৃতি পুস্তকের নামকরণে প্রযুক্ত অর্থহীন শব্দের ন্যায় কেবল কথার রূপকে পর্য্যবসিত হইবে। তখন শুভ্র কাঞ্চন-জঙ্ঘা-হীরক-কিরীট-ভূষণা, শ্যামবিটপি-মণ্ডিত-বিন্ধ্যাচলমেখলা, সিন্ধুগঙ্গাযমুনা-স্তন্য-পীযূষ-ধারা-বাহিনী, মলয়বিধূনিত-শস্যশ্যাম-লাঞ্চলা, দিগন্তবিসারিত-নীলাম্বুধি-চুম্বিতচরণা ভারতমাতার স্নিগ্ধ ক্রোড়ে লালিত হইয়াও তাঁহাকে কেহ চিনিবে না। তখন নিজ বাসভূমে সকলে পরবাসী হইবে। ইহা অপেক্ষা জাতির অপমৃত্যু আর কি হইতে পারে?

জাতীয় গৌরবে জলাঞ্জলি দিয়া যদি হিন্দুজাতি পৃথিবীর

অন্যান্য জাতির সহিত মিলিত হইতে চেষ্টা করে, তবে সেই সকল প্রবলপরাক্রান্ত আধুনিক-সভ্যতাদৃপ্ত জাতি তাহাকে তাহাদের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিবে কি? তাহা কখনই সম্ভব নহে। ইহার প্রমাণ, দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয় জাতিদিগের অবস্থা। যে সকল ভারতবাসী ব্যবসায়-বাণিজ্যের অনুরোধে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় চিরস্থায়ী ভাবে বাস করিতেছে, তাহাদের দুরবস্থার কথা সকলেই অবগত আছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনিবিষ্ট সুসভ্য জাতিবৃন্দ সেই সকল ভারতবাসীকে মানুষ বলিয়াই গণ্য করে না। তাহারা বিশ্বমানবতার অনুরোধে স্বকীয় জাতীয় স্বার্থ বিন্দুমাত্রও ছাড়িতে প্রস্তুত নহে। স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় গিয়াছিলেন, তখন কালা আদ্‌মি বলিয়া অনেক হোটেলে পর্য্যন্ত তাঁহার স্থান হয় নাই। সুসভ্য আমেরিকারও বিশ্বমানবতার পরিচয় ইহাতে সুপরিস্ফুট। পরে যখন সেই কৃষ্ণকায় ভারতবাসী সিকাগোর বিশ্বধর্ম্মসভায় তাঁহার হিন্দুত্বের পরিচয় দিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিলেন, তখন লোকে তাঁহার আদর করিতে আরম্ভ করিল। তিনি তাঁহার হিন্দু-জাতীয়তার, হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বজনীনতার যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা লাভ হইল। জাতীয়তা-বিনাশের দ্বারা বিশ্বমানবতার উৎপত্তি হয় না, বরং জাতীয়তার বিকাশের দ্বারা তাহা ফুটিয়া উঠে। আর আমাদের বিশ্বজনীন হিন্দুধর্ম্মের অনুশীলন দ্বারাই বিশ্বমানবতার পূর্ণ বিকাশ হয়।

বিশ্বপ্রেমিক কাহাকে বলিব? যিনি নিজের জননী, নিজের

ভ্রাতা ভগিনীকে ভালবাসিতে পারেন না, অথচ যিনি বলেন, আমি বিশ্ব-মানবকে ভালবাসি, তাঁহাকে আমরা কি মনে করিব ? যিনি নিজের গ্রামের কোন উন্নতির চেষ্টা করেন না, অথচ যদি তিনি বলেন, আমি একজন দেশহিতৈষী, তাঁহাকে আমরা কি বলিব ? তাঁহার নাম ইংরেজি ভাষায় hypocrite, আর বাঙ্গালা ভাষায় ভণ্ড। বলা বাহুল্য, নিজ গ্রামকে অবলম্বন করিয়া অনুশীলনের দ্বারা যেরূপ দেশপ্রীতি বিকশিত হয়, সেইরূপ নিজের পরিবার, নিজের সমাজ, নিজের জাতিকে অবলম্বন করিয়া ক্রমানুশীলনের দ্বারা বিশ্বপ্রীতি বিকশিত হয়। ইহা হৃদয়ের শিক্ষা, শুধু মস্তিষ্কের শিক্ষা নহে। হৃদয়ের শিক্ষা বলিয়াই ইহা দীর্ঘকালের অভ্যাস ও অনুশীলন-সাপেক্ষ। আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সেই বিশ্বপ্রীতির ক্রম বিকাশ হয়। হিন্দু গৃহস্থের দৈনিক অনুষ্ঠেয় সন্ধ্যা তর্পণ অতিথিসেবা প্রভৃতি সাধন দ্বারা ক্রমশঃ বিশ্ব-প্রীতি বিকাশ লাভ করে। সেই তর্পণের মন্ত্রই ইহার প্রমাণ—

> দেবা যক্ষা স্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাঽপ্সরসোঽসুরাঃ।
> ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবোজিহ্মগাঃ খগাঃ॥
> বিদ্যাধরা জলাধারা স্তথৈবাকাশগামিনঃ।
> নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে॥
> তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥

এই শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক স্মরণে ও জলগণ্ডূষ দানে দেবতা অসুর খেচর ভূচর জলচর ধর্ম্মাত্মা পাপাত্মা কোন প্রাণীই বাদ পড়ে নাই।

যে ভক্তিযোগ অবলম্বনে আমাদের দৈনিক সন্ধ্যা-পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়, শ্রীশ্রীদেবী-গীতায় তাহার ক্রম-বিকাশ এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। মানুষের প্রকৃতি-অনুসারে ভক্তিও তিন প্রকারের—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। যিনি তামস প্রকৃতির লোক তিনি পরের অনিষ্ট চেষ্টা করেন, সেই উদ্দেশ্যে তিনি দেবতার আরাধনাও করেন।

পরপীড়াং সমুদ্দিশ্য দম্ভং কৃত্বা পুরঃসরং।
মাৎসর্য্যক্রোধযুক্তো যস্তস্য ভক্তিস্তু তামসী॥

যিনি রাজসিক প্রকৃতির লোক, তিনি পরের অনিষ্ট চিন্তা করেন না, তিনি ভোগাসক্ত হইয়া নিজের কল্যাণের জন্য যশের আকাঙ্ক্ষা করিয়া দেবতার পূজা করেন।

পরপীড়াদি-রহিতঃ স্বকল্যাণার্থ মেবচ।
নিত্যং সকামো হৃদয়ে যশোঽর্থী ভোগলোলুপঃ॥

ইহাই রাজসিক ভক্তি। সাত্ত্বিক ভক্ত পরের অনিষ্ট চিন্তা করেন না, তাঁহার ভোগাসক্তিও নাই, তিনি পাপ-সংক্ষালনের জন্য অবশ্য-কর্ত্তব্যজ্ঞানে বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং সেই কর্ম্মফল ভগবচ্চরণে সমর্পণ করেন।

পরমেশার্পণং কর্ম্ম পাপসংক্ষালনায় চ।
বেদোক্তত্বাদবশ্যন্তৎ কর্ত্তব্যন্তু ময়ানিশং॥
ইতি নিশ্চিত-বুদ্ধিস্তু ভেদবুদ্ধিমুপাশ্রিতঃ।
করোতি প্রীতয়ে কর্ম্ম ভক্তিঃ সা নগ সাত্ত্বিকী।

এই তিন শ্রেণীর সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভক্তির নাম অপরাভক্তি। অধিকারী অনুসারে এই সাত্ত্বিক ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে পরাভক্তির বিকাশ হয়। অপরাভক্তি সাত্ত্বিক হইলেও তাহাতে ভেদজ্ঞান থাকে, পরাভক্তিতে ভেদজ্ঞান থাকে না। তখন সেব্যসেবকতা ভাব তিরোহিত হয়। তখন ভক্ত মোক্ষ-বাঞ্ছাও করেন না।

পরানুরক্ত্যা মামেব চিন্তয়েদ্ যোহতন্দ্রিতঃ।
স্বাভেদেনৈব মাং নিত্যং জানাতি ন বিভেদতঃ॥
মদ্রূপত্বেন জীবানাং চিন্তনং কুরুতে তু যঃ।
যথা স্বস্যাত্মনি প্রীতি স্তথৈব চ পরাত্মনি ॥
চৈতন্যস্য সমানত্বাৎ ন ভেদং কুরুতে তু যঃ।
সর্ব্বত্র বর্ত্তমানাং মাং সর্ব্বরূপাঞ্চ সর্ব্বদা॥
নমতে যজতে চৈবাপ্যাচাণ্ডালান্তমীশ্বর।
ন কুত্রাপি দ্রোহবুদ্ধিং কুরুতে ভেদবর্জ্জনাৎ॥

ইত্যাদি—

তখন ভক্ত পরম অনুরাগের সহিত জগজ্জননীকে নিজের আত্মার সহিত সর্ব্বদা অভেদ ভাবে চিন্তা করেন। আবার জীবগণও তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ বলিয়া সমস্ত প্রাণীর প্রতি আত্মবোধে প্রীতি করেন। চৈতন্য-বস্তু সর্ব্বত্রই সমান ভাবে বিদ্যমান জানিয়া কোন প্রকার ভেদ-জ্ঞান করেন না। তিনি জগন্মাতাকে সর্ব্বত্র বিদ্যমান দেখেন। সেই জন্য আচণ্ডাল সমস্ত

মানবকে তিনি পূজা করেন এবং কাহাকেও দ্বেষ করেন না। বলা বাহুল্য, যে ভক্তের এইরূপ অভেদ জ্ঞান হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিক, তাঁহারই ভক্তি জ্ঞানের চরমসীমায় উঠিয়াছে। এইরূপ ভক্তিসাধনার যে চরম ফল, জ্ঞানসাধনারও সেই চরম ফল।

ভক্তেশ্চ যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় ও জ্ঞান-যোগের চরম ফল এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

জ্ঞানিগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে, গরুতে, হস্তীতে ও কুকুরে সমদর্শী, কারণ চৈতন্য বস্তু ইহাদের সকলের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। এই সমতাজ্ঞানই ভগবানের প্রকৃত আরাধনা। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ দৈত্য-শিশুকে উপদেশ দিতেছেন—

সর্ব্বতো দৈত্যাঃ সমতামুপেত
সমত্বমারাধন মচ্যুতস্য॥

হে দৈত্যশিশুগণ! তোমরা সমদর্শী হও; সমদর্শী হওয়াই বিষ্ণুর আরাধনা।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, বিশ্বমানবতা শিক্ষার জন্য আমাদের জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেওয়ার প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই আমরা সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা লাভ

করিতে পারি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের তপস্যার ফলে বিশ্ব-প্রীতির বীজ এখনও আমাদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। উপযুক্ত সুযোগ পাইলেই তাহা স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে। এই যে দামোদর-বন্যা-প্রপীড়িত বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া অঞ্চলের সহস্র সহস্র অধিবাসিগণের দুরবস্থা দর্শনে সমগ্র দেশব্যাপী গভীর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়াছিল, শত শত স্বেচ্ছা-সেবকের দল আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ও অসীম ক্লেশ সহ্য করিয়া আর্ত্তসেবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন, ইহা দ্বারা কি বুঝা যায়? ইহা দ্বারা বুঝিতে পারি, সমাজে জাতিভেদ উচ্চ-নীচ-ভেদ থাকা সত্ত্বেও humanityর অভাব হয় নাই। সুতরাং humanity বা বিশ্ব-প্রীতি লাভের জন্য আমাদের জাতীয়তা বিসর্জ্জন দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই।

হিন্দুসমাজে অতি প্রাচীন কাল হইতে জাতিভেদপ্রথা রহিয়াছে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ চণ্ডাল মুচি মেথর ডোম প্রভৃতি নিম্ন জাতির সহিত আহারাদি করেন না। কিন্তু তাহাতে ঘৃণা, দ্বেষ নাই। কেবল আত্মরক্ষাই এরূপ ভেদজ্ঞানের কারণ। একজন উন্নত ভক্ত বা উন্নত জ্ঞানী ব্রাহ্মণ একজন মুচী, মেথর বা ডোমকে পূজা করিতে পারেন, কারণ তাঁহার ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে। তিনি সকল জীবের মধ্যে একমাত্র নারায়ণকে দেখেন। যতদিন এইরূপ সমদর্শিতা লাভ না হইবে, ততদিন উচ্চ-নীচ-ভেদজ্ঞান থাকিবেই থাকিবে। যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজের নিম্ন জাতিদিগের উন্নতি-চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা

সকলের ধন্যবাদার্হ। কারণ সমাজের এক প্রধান অঙ্গ বিকল হইয়া থাকিলে সমাজশরীর সবল থাকিতে পারে না। কিন্তু তাঁহাদিগকে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ থাকিয়া চণ্ডালকে উন্নত করিতে হইবে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে যে উচ্চ আদর্শ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা অক্ষুন্ন রাখিয়া নিম্ন জাতির উন্নতি-বিধান করিতে হইবে। উচ্চ জাতির মধ্যে প্রচলিত উচ্চ আদর্শ শিথিল করিয়া দিলে, নিম্ন জাতির ত উন্নতি হইবেই না, অধিকন্তু উচ্চজাতিসকল নিম্নস্তরে নামিয়া পড়িবে। স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রগণকে গ্রাজুয়েট (graduate) করিতে হইলে, বি. এ শ্রেণীর Standard (পাঠ্যমান) ঠিক রাখা আবশ্যক। নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য বি. এ শ্রেণীর পাঠ্য কমাইয়া দিলে সকলেই বি. এ হইতে পারে, কিন্তু তখন সেই B. A শব্দের অর্থ Bachelor of arts না হইয়া ba বে হইবে। আজ কাল নমঃশূদ্রাদি জাতি ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সংযত ও মিতাচারী হইতেছে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ থাকিলে কালে চণ্ডাল ব্রাহ্মণ হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হইলে সমাজ চণ্ডালময় হইয়া যাইবে।

কেহ কেহ বলিতেছেন, হিন্দুজাতি মুমূর্ষু-দশা-প্রাপ্ত ("Dying Race"),—ভারতের মুসলমানাদি অন্যান্য জাতির তুলনায় হিন্দুজাতির জন-সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে—এরূপভাবে কমিয়া গেলে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। ইঁহাদের মতে হিন্দুর কঠোর সমাজবন্ধনই এই লোকক্ষয়ের

কারণ। হিন্দুর জাতি-ভেদ-প্রথার জন্য অন্য সমাজের লোক হিন্দু হইতে পারে না, কিন্তু হিন্দুসমাজের অনেক লোক মুসলমান বা খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে। মুসলমান বা খ্রীষ্টান-সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকায় তাহাদের জনসংখ্যা বাড়িতেছে, হিন্দুর মধ্যে বিধবা-বিবাহ না থাকায় সে উপায়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্রে অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের যুক্তিই আমরা কতক কতক শুনিয়াছি। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে মাত্র একটা কথা বলিতে চাই। কোন জাতি বাঁচিয়া থাকে কেবল জনসংখ্যা দ্বারা নহে, তাহার বিশেষ ভাবের দ্বারা, তাহার National Ideal (জাতীয় আদর্শ) দ্বারা। যে জাতির যে Idealটি তাহার জীবনের অস্থি মজ্জা, তাহার Life-blood—সেই ভাবটি যতদিন তাহার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন সেই জাতির সংখ্যা মুষ্টিমেয় হইলেও তাহাকে জীবিত বলা যায়। আবার সেই ভাবটির অভাব হইলে সে জাতি সংখ্যায় বিপুল হইলেও তাহাকে জীবিত বলা যায় না। বর্ত্তমান গ্রীকজাতি, ইটালিয়ান জাতি জীবিত কি মৃত? আমি বলিব, মৃত। পুরাকালে গ্রীকজাতির শিল্প, সাহিত্য, দর্শনশাস্ত্র জগতে অতুলনীয় হইয়া সেই জাতিকে অশেষ গৌরবান্বিত করিয়াছিল। এই গ্রীকজাতি এক সময়ে ইউরোপের শিক্ষাগুরু ছিল। রোমান জাতিও এক সময়ে তাহাদের শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম, সাম্রাজ্যবিস্তার, রাজ্যশাসনপ্রণালী, ব্যবহারবিধি (Jurisprudence), শিল্পকলা দ্বারা জগতের শীর্ষস্থান অধিকার

করিয়াছিল। কিন্তু নানাকারণে গ্রীক ও রোমান্‌দিগের এই সকল জাতীয় আদর্শ বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন উভয় জাতিই নগণ্য হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের জনসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু গ্রীক ও রোমান্‌ জাতি এখন মৃত তাহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

হিন্দুজাতির লোকসংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মপ্রাণতা, সংযম, মিতাচার, বিশ্বপ্রেম, হিন্দুনারীর পাতিব্রত্য যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন এ জাতির মৃত্যু নাই। এই সকল জাতীয়-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া হিন্দু যদি মুসলমানাদি জাতির সহিত মিশিয়া যায়, তবে ভারতবর্ষের জন-সংখ্যা বাড়িতে পারে, কিন্তু পৃথিবী হইতে হিন্দুনাম বিলুপ্ত হইবে। সেই বিশ্বনিয়ন্তার কি অভিপ্রায় তাহা তিনিই জানেন। তিনি অর্জ্জুনের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি",—হে অর্জ্জুন, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পার, আমার ভক্তের কখনও মৃত্যু নাই। হিন্দু তাঁহার এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া অনন্যচিত্তে তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিবে। যদি তাঁহার এই মহাবাক্য সত্য হয়, তবে হিন্দুজাতি কখনও মরিবে না।

শরতের প্রকাশ।

হিমাচলের একটি নিভৃত-গুহায় ঋষি ধ্যানমগ্ন। তিনি পরমাত্মায় সমাধিস্থ হইয়াছেন। তাঁহার চেতনা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধ্যাদি রাজ্য অতিক্রম করিয়া সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড, অনন্ত চিৎসত্তায় নিমগ্ন হইয়াছে। বহির্জ্জগৎ তাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত; তিনি অন্তর্জ্জগতের অন্তরতম প্রদেশে হৃদয়গুহাভ্যন্তর-স্থিত চিদাকাশে বিলীন হইয়াছেন।

একদিন প্রভাতে অকস্মাৎ তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। তখন আবার তাঁহার শরীরে চেতনার সঞ্চার হইল, আবার তাঁহার চিত্তবৃত্তি স্বস্ব বিষয়াভিমুখে ধাবিত হইল, আবার তাঁহার নিকটে বহির্জ্জগতের সত্তা পূর্ব্ববৎ প্রতিভাত হইল। এইরূপে হঠাৎ কেন তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া, তিনি গিরিগুহা হইতে বাহিরে আসিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গের শিরোদেশে আরোহণপূর্ব্বক প্রজ্ঞানেত্রে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তিনি কি দেখিলেন? তিনি দেখিলেন, বর্ষা অতীত হইয়া শরৎ-ঋতুর আগমনে জড়জগতে এক মহাপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। নভোমণ্ডল নিবিড় ঘনজাল-বিমুক্ত হইয়া অত্যুজ্জ্বল সুনীল-শোভা ধারণ করিয়াছে। সেই গাঢ়-নীলিমার মধ্যে স্থানে স্থানে দুই এক খণ্ড রজতশুভ্র মেঘ বারিধি-বক্ষঃস্থ ফেনপুঞ্জের

ন্যায় শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয়ের শোভা কি বিচিত্র, কি মনোহর, কি অনির্ব্বচনীয়! বর্ষাকালে যে সূর্য্যকে অধিকাংশ সময় সুদৃঢ় মেঘপ্রাকারের অভ্যন্তরে গুপ্ত হইয়া থাকিতে হইত, কদাচিৎ কখনও যাঁহার উদয় অস্ত দেখা যাইত; আজ কি না তিনি পূর্ব্বাকাশ কনককান্তিতে রঞ্জিত করিয়া, স্নিগ্ধ-ধবল মেঘমণ্ডলীকে কিরণ-ধারায় সিঞ্চিত করিয়া, বৃক্ষ লতা পাতা মনুষ্য পশু পক্ষীর মধ্যে অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া, হাসিমাখা মুখে উদিত হইতেছেন। সুধাকর এত দিন প্রায়ই সলিলধূম-নিমগ্ন, ক্ষীণপ্রভ, পরিম্লানশ্রী ছিলেন,—তিনি এখন নিশীথে সমুদিত হইয়া রজতময়, সুধামাখা কিরণাসারে আকাশ, ভূমিতল, বনস্থলী, নদনদী, সরোবর প্লাবিত করিয়া প্রভাতে নীলাম্বরের অন্তরালে লুকাইতেছেন। নদ-নদী-সরোবর-সকল সলিলরাশি-পরিপূর্ণ হইয়া যেন মৃতদেহে নবযৌবন লাভ করিয়াছে। বনস্থলীসকল অনবরত বারিধারা-সম্পাতে বিধৌত ও গাঢ়-শ্যামল পত্রনিচয়ে সমাবৃত হইয়া এক অভিনব শোভা ধারণ করিয়াছে। উদ্যানসকল মালতী-মল্লিকা, চম্পক-সেফালিকা, চামেলি-যূথিকা, জবা-অপরাজিতা, কুরুবক-স্থলপদ্ম প্রভৃতি কুসুমনিকরে সুশোভিত হইয়াছে। সরোবর সকল বিকচ কমল-কুমুদ-কহ্লারে খচিত হইয়াছে।

এইরূপে ঋষি দেখিলেন সকলই সুন্দর, সকলই শোভাময়, সকলই মনোরম, সকলই নবজীবনলাভ করিয়াছে। যেন জড়-প্রকৃতির জড়ত্ব দূরীভূত হইয়া তাহাতে এক অভিনব জীবনীশক্তির সঞ্চার হওয়াতে আ'জ তিনি সুপ্তোত্থিতার ন্যায় জাগ্রত হইয়াছেন।

ঋষি চিন্তা করিতে লাগিলেন, আজ জড়জগৎ এই নবজীবন লাভ করিল কেন? মধুময় মধুমাসের বসন্তোৎসবের ন্যায় আজ জগৎ আবার এই নব উৎসবে মাতিল কেন? তিনি দেখিলেন আজ যে কারণে তাঁহার অকস্মাৎ ধ্যানভঙ্গ হইয়াছে, সেই কারণে এই জড়জগতেও এক অভিনব জীবনীশক্তির উন্মেষ হইয়াছে। তাঁহার আত্মা আর জড়জগতের আত্মা এক অখণ্ড চিৎশক্তিতে সম্বদ্ধ। তিনি দেখিলেন, যেমন গিরিনির্ঝরিণী নিভৃত গুহার মধ্যে চিরতরে লুক্কায়িত থাকিতে চাহে না, প্রবল ধারাপ্রপাতে উপত্যকা, বনস্থলী, গ্রাম, নগর প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়; সুরনদী মন্দাকিনী যেমন ব্রহ্মার কমণ্ডলুর মধ্যে চিরকালের জন্য আবদ্ধ থাকেন নাই, ত্রিস্রোতাঃ হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল প্লাবিত করিয়াছেন; সেইরূপ জগতের জীবনীশক্তিরূপিণী, জীবনদায়িনী আদ্যাশক্তি সর্ব্বদা ধ্যানযোগ-নিরত ঋষির হৃৎপদ্মে লুক্কায়িত থাকিতে ইচ্ছা করেন না; সেই পতিতপাবনী, দুরিত-তারিণী, ত্রিজগদুদ্ধারিণী মহাশক্তি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৌন্দর্য্যতরঙ্গ ছুটাইয়া স্থূলজগতে প্রকট হইয়া থাকেন। তখন তাঁহারই অনন্তশক্তির প্রভাবে বর্ষাকালীন সুষুপ্ত জড়জগতে নবজীবনের সঞ্চার হয়; তাঁহারই অনুপম সৌন্দর্য্যধারা সুনীল আকাশে, শুভ্র মেঘমালায়, প্রভাতের অরুণরাগে, নিশীথের সুধাকরে, বারিপূর্ণ নদ-নদী-তড়াগের মৃদু বীচিবিক্ষেপে, নিবিড়গাঢ়কৃষ্ণ-পত্ররাজি-সজ্জিত বনস্থলীতে, রজতদ্রব-প্রবাহী ঝঙ্কৃতনিনাদী গিরিনির্ঝরে, কুসুমাকর-সমুজ্জ্বল উদ্যানে, বিকচ-কমল-কুমুদ-প্রতিবিম্বিত সরসীমুকুরে প্রবাহিত

হইয়া থাকে। এইরূপে সেই মহাশক্তির মহালীলা শীতঋতুর অবসানে ও বসন্ত-সমাগমে নবোদ্‌গত-কিশলয়-রুচির তরুলতা-রাজিতে, বিচিত্র-কুসুমাভরণ-মণ্ডিত গহনকাননে, দেহ-রোমাঞ্চকারী সুস্নিগ্ধ-মৃদু-মলয়হিল্লোলে, স্বরসুধাসারপ্লাবী পিককুলের সুমধুর কলকণ্ঠে, মৃদুল-প্রভাত-বাত-বিধূত, ভ্রমর-গুঞ্জরিত কুসুমস্তবকে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঋষি দেখিলেন, বসন্তকালে জড়জগতে যে মহালীলা প্রকটিত হইয়াছিল, আবার শরৎকালে তাহারই পুনরাবৃত্তি হইতেছে। যেমন শীতঋতুর নিস্পন্দ জড়তার পরে বসন্তের নব-জীবন-স্ফূর্ত্তি, সেইরূপ বর্ষার নিস্তেজ-সুষুপ্তির পরে এই শরতের সঞ্জীবনীশক্তি-বিকাশ। ইহা সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার ন্যায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী মহাশক্তির আকুঞ্চন-প্রসারণ, হ্রাস-বৃদ্ধি ও ঘাতপ্রতিঘাত-লীলা। ঋষি দেখিলেন, তিনি সমাধিমগ্ন হইয়া স্বীয় হৃদয়কন্দরমধ্যস্থিত যে মহাশক্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপ ধ্যান করিতে-ছিলেন, আজ তিনিই প্রকটলীলা সাধন করিবার জন্য বহির্ম্মুখী হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন। মহাশক্তির সেই বহির্ম্মুখীন গতিতে তাঁহার সমাধি-ভঙ্গ হইয়াছে।

তখন ঋষি চিন্তা করিলেন, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপিণী মহাশক্তির স্থূলজগতে এই প্রকটলীলার প্রয়োজন কি? যিনি স্বভাবতঃ অণু অপেক্ষাও অণু,—যিনি নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন,—যিনি অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষরূপে জনগণের হৃদয়মন্দিরে বিরাজ করিতে-ছেন,—যাঁহাকে শুভ্র জ্যোতির জ্যোতিঃ ও নিষ্কল ব্রহ্মরূপে যোগিগণ হিরণ্ময়কোষে বিরাজমান দেখিয়া কৃতার্থ হন, সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতমা

মহাশক্তি কেন ও কি প্রকারে স্থূল জড়জগতে প্রকাশিতা হন ?

শ্রুতিগণ বলিয়াছেন, সেই মহাশক্তি দুইপ্রকার স্বভাবসম্পন্না। তিনি যেমন সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতমা, সেইরূপ আবার স্থূল হইতেও স্থূলতমা। তিনি যেমন অণু হইতেও অণু, সেইরূপ আবার মহৎ হইতেও মহীয়সী। তিনি যেমন সর্ব্বগত, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভুরূপে প্রকাশিতা হন, সেইরূপ আবার বৃহৎ, দিব্য, অচিন্ত্যরূপেও পরিব্যক্ত হন। তিনি যেমন অন্তঃশরীরে শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়ী, তেমন আবার তাঁহারই প্রভা হইতে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, বহ্নি, স্ব স্ব প্রভা পাইয়া দীপ্তিমান হইতেছে। তিনি যেমন অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষরূপে সদা জনগণের হৃদয়ে বিহার করিতেছেন, সেইরূপ আবার সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ পুরুষরূপে এই দ্যাবা-পৃথিবী ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তিনি যেমন ঘৃতের পরবর্ত্তী অতিসূক্ষ্ম মণ্ডের ন্যায় সর্ব্বভূতের মধ্যে গূঢ়ভাবে আছেন, সেইরূপ আবার ক্ষীরস্থ সর্পির ন্যায় সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন। সেই মহাশক্তির মহালীলা বর্ণনা করে কাহার সাধ্য ?

সেই মহাশক্তি জড়স্বভাবা নহেন, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময়ী। তিনি ত্রিজগতের প্রসূতি, ত্রিজতের পালনকর্ত্রী। ত্রিজগতের কল্যাণের জন্য তিনি সর্ব্বদা মঙ্গলময়ীতনু ধারণ করিয়া আছেন। ত্রিজতের জীবের প্রতি তাঁহার দয়ার সীমা নাই, অথবা দয়াই তাঁহার স্বরূপ। তিনি জানেন যেরূপ জগদ্‌বন্দ্য যোগিগণ নানাপ্রকার কঠোর তপঃ-সাধনদ্বারা তাঁহাকে পাইবার জন্য লালায়িত, অধম আপামরসাধারণ

নরনারীগণও তাঁহার চরণকমল দর্শন লালসায় সেইরূপ ব্যগ্র। কিন্তু সেই সকল আপামরসাধারণ নরনারীর তাঁহার সেই সমাধিগম্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপ দর্শন করিবার শক্তি-সামর্থ্য কোথায় ?

তিনি জনগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজমান থাকিলেও তাঁহার সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপ দর্শন করা অতি কঠোর তপঃসাধনসাপেক্ষ। বহ্নি ইন্ধনযোনিগত থাকিলেও তাহাকে অপর কাষ্ঠখণ্ডদ্বারা ঘর্ষণ করিলে তবে তাহা মূর্ত্তি-গ্রহণপূর্ব্বক সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সেইরূপ শ্রুতি বলেন, নিজ দেহকে অরণি ও প্রণবমন্ত্রকে উত্তর অরণি করিয়া ধ্যানরূপ নির্ম্মথন অভ্যাস করিতে করিতে অবশেষে সেই আত্মমধ্যস্থ ব্রহ্মপদার্থের দর্শন পাওয়া যায়। তিলমধ্যস্থ তৈলের ন্যায়, দধিমধ্যস্থ সর্পির ন্যায়, স্রোতোমধ্যস্থ জলের ন্যায় ও অরণিকাষ্ঠমধ্যস্থ অগ্নির ন্যায়, আত্মমধ্যস্থ ব্রহ্মপদার্থকে দর্শন করা বড়ই কঠোর তপস্যা-সাপেক্ষ। আত্মবিদ্যা ও তপস্যা ভিন্ন ক্ষীরে পরিব্যাপ্ত সর্পির ন্যায় সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার দর্শন লাভ ঘটে না। সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ নিশিত-ক্ষুরধার-সমাকীর্ণ পথের ন্যায় বড়ই দুর্গম। কেবল সূক্ষ্মদর্শী যোগিগণ কুশাগ্র-তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও প্রকৃতির রাজ্য অতিক্রম করিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন। কিন্তু তোমার আমার ন্যায় আপামরসাধারণ লোকের উপায় কি ?

তাই করুণাময়ী বিশ্বমাতা তাঁহার মূঢ় সন্তানগণের উদ্ধারের জন্য কখন কখন স্থূলমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে দেখা দেন। যাহাদের জড়বুদ্ধি এই জড়জগতের অন্তরালে অবস্থিত,

অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারে না, তাহাদের উদ্ধারের জন্য তিনি জড়জগতে অশেষ সৌন্দর্য্যসার তনু লইয়া প্রকটিত হন। তাঁহারই অতুলনীয়রূপরাশি তখন জড়জগতের প্রতি অণুতে অণুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। বৎসরের যে যে সময়ে তাঁহার এই প্রকটলীলা জড়জগতে আবির্ভূত হয়, তাহাই বসন্ত ও শরৎ নামে খ্যাত। তাই গীতায় তিনি বলিয়াছেন, আমি "ঋতূনাং কুসুমাকরঃ" অর্থাৎ ঋতুদিগের মধ্যে বসন্তকাল। এস্থলে লক্ষণাদ্বারা শরৎকালও ধরা যাইতে পারে। তাই এই দুই ঋতুতে, শরতে ও বসন্তে সেই মহাশক্তির মহাপূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই সকল চিন্তা করিতে করিতে ঋষি দেখিলেন, সমুদ্রের জোয়ারের ন্যায় সেই মহাশক্তির সৌন্দর্য্যপ্রবাহ দেখিতে দেখিতে ত্রিভুবন প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহা সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে, সূক্ষ্মরূপে ও স্থূলরূপে, জীবগণের মধ্যে অন্তর্বৃত্তিরূপে ও ভূতগণের মধ্যে জড়তত্ত্বরূপে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়া ঋষি বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে, ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে সেই মহাশক্তির স্তব করিতে লাগিলেন। যথা—

"নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥
রৌদ্রায়ৈ নমোনিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমোনমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ॥

* * * * * *

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমোনমঃ॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

উমার তপস্যা।*

(কুমারসম্ভব অবলম্বনে লিখিত)

দক্ষরোষে দাক্ষায়ণী তনুত্যাগ করিলে পশুপতি মহেশ্বর উৎকট তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি মৃগনাভি-গন্ধি, কিন্নর-গীতিমুখর, গঙ্গাপ্রবাহসিক্ত, দেবদারুদ্রুমসমাকীর্ণ হিমাচল-প্রস্থে অধিষ্ঠান করিলেন। কিন্তু বাক্য ও অর্থের ন্যায় যাঁহাদের মধ্যে নিত্যসম্বন্ধ বিদ্যমান, সেই ত্রিজগতের জনকজননী কি কখনও পরস্পর বিযুক্ত হইয়া থাকিতে পারেন? তাই জগজ্জননী সতী গিরিরাজ হিমালয়ের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া সদাশিবের সহিত পুনর্ব্বার মিলিত হইতে বাসনা করিলেন।

উমা ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার অনুপম রূপমাধুরীতে নগরাজ-মহিষী দ্বিতীয়ার চন্দ্রলেখালিঙ্গিত সন্ধ্যাদেবীর শোভা ধারণ করি-লেন। দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমান শশিকলার ন্যায় সেই নবজাত কুমারীর লাবণ্যময় অবয়বসকল পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার তনুলতা প্রসিদ্ধশিল্পিহস্তাঙ্কিত চিত্রের ন্যায় অথবা সৌরকরোদ্ভিন্ন অরবিন্দের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিল। সুন্দরী রমণীর মুখশ্রী কখনও পদ্মের সহিত কখনও বা চন্দ্রের সহিত তুলিত হইয়া থাকে; কিন্তু কান্তিদেবী উমার মুখে বিরাজিত থাকিয়া একাধারে পদ্ম ও চন্দ্রের সঙ্গ-সুখ-লাভে

---

* নদীয়া সাহিত্য-পরিষদের ১৩২৫ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

অচঞ্চল হইয়া রহিলেন। সে মুখের হাস্য কিরূপ? না আরক্ত-নবকিসলয়দলের উপর যদি কুন্দকুসুম বিন্যস্ত হয়, অথবা প্রবালের সহিত যদি মুক্তাফল মিলিত হয়, তবে সেই বিম্বাধরবিলসিত সুধাময় নির্ম্মলহাস্যের তুলনা হইতে পারে। ফলতঃ জগতের যেখানে যে সুন্দর বস্তু ছিল তাহা একত্র সমাহৃত দেখিবার অভিপ্রায়েই যেন বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা বহুযত্নে সেই সৌন্দর্য্যকলা তিলে তিলে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া এই তিলোত্তমা-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন।

গিরিরাজ নারদের মুখে শুনিয়াছিলেন তাঁহার এই অলোক-সামান্যা কন্যা আর কেহ নহেন—হরের দেহার্দ্ধভাগিনী সতী। সুতরাং কন্যা প্রাপ্ত-যৌবনা হইলেও তিনি তাঁহার বিবাহের জন্য অন্য বরের অনুসন্ধান করিতে বিরত হইলেন। কিন্তু মহেশ্বর ত এখন যোগ-নিমগ্ন রহিয়াছেন, তাঁহার সহিত উমার বিবাহ কিরূপে সংঘটিত হইবে? অদ্রিনাথ উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বীয় কন্যাকেই দুইজন সখী-সমভিব্যাহারে তপো-নিরত শিবের সেবায় নিযুক্ত করিলেন।

এদিকে প্রজাপতি-বরদৃপ্ত তারকাসুরের পরাক্রমে পরাস্ত দেবগণ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। চতুর্ম্মুখ তাঁহাদের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তারক-নিধনের একমাত্র উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন—অর্থাৎ পার্ব্বতীর গর্ভে হরের ঔরসজাত তনয় উৎপন্ন হইলে তাঁহার দ্বারা তারকাসুর নিহত হইবে। কিন্তু কে এখন উৎকট-তপস্যা-নিরত শূলপাণির সহিত শৈলসুতার মিলন ঘটাইতে পারে? দেবরাজ ইন্দ্র মন্মথকে স্মরণ করিয়া তাঁহার

প্রতি এই গুরুতর কার্য্যভার অর্পণ করিলেন। কামদেব রতি-দেবীর সহিত তাঁহাদের চিরসহচর বসন্তকে লইয়া পশুপতির তপোভূমি হিমালয়-প্রস্থে আবির্ভূত হইলেন।

অকস্মাৎ অকাল-বসন্ত সমাগমে সেই বনস্থলীতে দিগ্‌বধূর উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় মলয়-মারুত প্রবাহিত হইল, সুন্দরীগণের নূপুরসিঞ্জিতের অপেক্ষা না করিয়া অশোকবৃক্ষ পুষ্প-পল্লব-শোভায় বিভূষিত হইল, নবোদ্‌গত চূতমুকুলে ভ্রমরগুঞ্জন শ্রুত হইল, পলাশ ও কর্ণিকার কুসুমের বর্ণরাগে দিগ্‌-বলয় সমুজ্জ্বল হইল, পিয়াল-মঞ্জরীর পরাগপাতে দৃষ্টিহীন হইয়া মদ-মত্ত মৃগগণ বনভূমিতে নিপতিত শুষ্কপত্রের উপর ধাবমান হইল, চূতাঙ্কুরাস্বাদে কষায়-কণ্ঠ কোকিল কুহুরবে মানিনী কামিনীর মানভঙ্গ করিতে লাগিল। কিন্তু মদন যখন রতি-দেবীর সহিত তাঁহার পুষ্পশরাসন লইয়া তথায় সমুদিত হইলেন, তখন স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা প্রকৃতির হৃদয়-তন্ত্রীতে এক মিলন-সঙ্গীতের সুর বাজিয়া উঠিল।

সেই সুরের তানে ভ্রমর পুষ্প-কোরক-রূপ-পানপাত্র হইতে ভ্রমরীর পীতাবশিষ্ট মধুপান করিল। কৃষ্ণসার-মৃগ শৃঙ্গদ্বারা প্রেমভরে সুখস্পর্শ-নিমিলিত-নেত্রা প্রেয়সীর গাত্র কণ্ডূয়ন করিল। করিণী পদ্ম-পরাগ-সুরভি বারি-গণ্ডূষ করীকে পান করাইল। চক্রবাক অর্দ্ধোপভুক্ত মৃণালখণ্ডদ্বারা প্রিয়তমার অভ্যর্থনা করিল। কিন্নর পুষ্পাসব-পান-নিরতা কিন্নরীর মুখে সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে শিশিরশোভিত পঙ্কজের ন্যায় তাহার শ্রমবিন্দু-শোভিত বদন চুম্বন করিল। জঙ্গম প্রাণীর কথা দূরে থাকুক স্থাবর বৃক্ষগণও

পর্য্যাপ্ত-পুষ্পস্তবক-বিনম্র আতাম্র-কিসলয়-রুচির লতাবধূগণের সানুরাগ ভুজবন্ধন-সুখ অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু সমাধি-নিরত মহেশ্বর এই প্রকৃতি-বিপর্য্যয়ে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না।

তাঁহার লতাগৃহ দ্বারে দ্বারপাল নন্দিকেশ্বর সুবর্ণময় বেত্রহস্তে দণ্ডায়মান। শিবানুচর প্রমথগণ বসন্তোৎসবে চঞ্চলতা প্রকাশ করিতেছে দেখিয়া তিনি মুখার্পিত অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। নন্দীর শাসনাতিশয্যে সেই বনভূমির বৃক্ষ সকল নিষ্কম্প, ভ্রমরগণ নিশ্চল, পক্ষিগণ নিস্তব্ধ,মৃগগণ গতিরহিত—সেই বনস্থলী একখানি স্থিরগতি চিত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। একটি দেবদারু-বৃক্ষের মূলে বেদির উপর ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসনে সমাসীন হইয়া ধ্যাননিষ্ঠ ত্র্যম্বক বিরাজ করিতেছেন। তিনি বীরাসনে উপবিষ্ট, তাঁহার দেহ-যষ্টি সরলভাবে উন্নত, তাঁহার করযুগল অঙ্ক মধ্যে উত্তানভাবে থাকিয়া প্রফুল্ল পঙ্কজের শোভাধারণ করিয়াছে। তাঁহার জটাবল্কল ভুজঙ্গবন্ধনে সংবদ্ধ, তাঁহার জপমালিকা কর্ণে দোদুল্যমান, তাঁহার স্কন্ধদেশে নীলবর্ণ কৃষ্ণসারচর্ম্ম উত্তরীয় রূপে বিন্যস্ত। তাঁহার নেত্রতারকা ঈষৎবিকশিত, নেত্রত্রয় ভ্রূবিক্ষেপ-শূন্য এবং অধোনিক্ষিপ্ত হইয়া নাসাগ্রভাগে বদ্ধদৃষ্টি। তাঁহার দেহান্তরবর্ত্তী বায়ু নিরুদ্ধ হওয়াতে তিনি বর্ষণপূর্ব্ব নবাম্বুদ অথবা নিস্তরঙ্গ জলাশয় অথবা নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির ও গম্ভীর। তাঁহার কপালনেত্র হইতে বিক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম কিরণ-রেখা মৃণাল-সূত্রাধিক-সুকোমল অর্দ্ধেন্দুলেখাকে মলিন করিয়া দিতেছে।

তিনি শরীরের নবদ্বার নিরোধ পূর্ব্বক জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লীন করিয়া অবস্থিত। কামদেব তাঁহার এই অতি-দুর্দ্ধর্ষ মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়চকিত হইলেন এবং তাঁহার হস্ত হইতে পুষ্পচাপ স্খলিত হইল।

এই সময়ে গিরিরাজকন্যা দুইটি বনদেবীর সহিত হরের পরিচর্য্যার নিমিত্ত সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মন্মথের নির্ব্বাণোন্মুখ বীরত্ব আবার সন্ধুক্ষিত হইল। পার্ব্বতী মণিমুক্তাভরণ পরিত্যাগ করিয়া কুসুমসজ্জায় ভূষিত হইয়া আসিয়াছেন। তিনি পদ্মরাগমণি-স্থলে অশোকপুষ্প, সুবর্ণালঙ্কার স্থলে কর্ণিকার-কুসুম এবং মুক্তা-মালার স্থলে সিন্ধুবারপুষ্পের মালা দ্বারা অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। তিনি অরুণ-বর্ণ বসন পরিধান করিয়া পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবক-নম্রা সঞ্চারিণী লতার ন্যায় শিব-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব এই সময়ে পরমজ্যোতিঃ-স্বরূপ পরমাত্মার সমাধিযোগ হইতে বিরত হইয়া বীরাসন ভঙ্গ করিয়া নিরুদ্ধ প্রাণবায়ু ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিলেন। পার্ব্বতীর সখীদ্বয় প্রণিপাতপূর্ব্বক সকিসলয়-বাসন্তিকপুষ্প হরচরণে নিবেদন করিলেন, উমাও অবনতমস্তকে শিবকে প্রণাম করিলেন। তখন তাঁহার নীলালকমধ্য হইতে কর্ণিকার কুসুম ও কর্ণযুগল হইতে কিসলয়াভরণ খসিয়া পড়িল। মহাদেব উমাকে অনন্যাসক্তচিত্ত পতি-প্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন কামদেব সময় বুঝিয়া তাঁহার শরাসনে বারম্বার জ্যা-আরোপণ করিতে লাগিলেন। গৌরী মন্দাকিনী-জল-সঞ্জাত-পুষ্কর-বীজমালা হরের

হস্তে সমর্পণ করিতেছেন এই সময়ে পুষ্পধন্বা তাঁহার চাপে সম্মোহন বাণ সংযোজিত করিলেন। হর চন্দ্রোদয়-চঞ্চল বারিধির ন্যায় ঈষৎ বিচলিত হইয়া উমার বিম্বাধরে সস্পৃহ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। শৈলসুতাও ব্রীড়া-বিভ্রান্তনেত্রে ও পুলকিত-কলেবরে তাঁহার সুচারু মুখারবিন্দ ঈষৎ বক্র করিয়া অবস্থান করিলেন। কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ত্রিলোচন তৎক্ষণাৎ চিত্তবিক্ষোভ দমন করিয়া, সেই চিত্তবিকৃতির কারণানুসন্ধানে চতুর্দ্দিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তখন তিনি দেখিতে পাইলেন অদূরে কামদেব তাঁহার মনোহর পুষ্পচাপে জ্যা-আরোপণ করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এইরূপ তপোবিঘ্ন উৎপন্ন হইতে দেখিয়া ধূর্জ্জটির ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল, তাঁহার বিকট মুখের ভ্রূভঙ্গি ভীষণ হইল, তাঁহার ললাটস্থ তৃতীয় নেত্র হইতে বহ্নিশিখা বিনির্গত হইল এবং আকাশস্থ দেবগণ—"প্রভো! ক্রোধ সংবরণ করুন—ক্রোধ সংবরণ করুন"—বলিতে না বলিতে হরনেত্রানলশিখা কামদেবকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। তপোনিষ্ঠ ভূতপতি তপস্যার বিঘ্নজনক কামিনীসঙ্গ পরিহার বাসনায় তৎক্ষণাৎ সগণে অন্তর্হিত হইলেন।

আর উমা কি করিলেন? তাঁহার পিতার উচ্চাভিলাষ ব্যর্থ হইল, তাঁহার বরবপুর কমনীয়কান্তি বিফল হইল, তাঁহার প্রেমাস্পদ পশুপতি তাঁহার হৃদয়ের প্রেম সখীদিগের সম্মুখে প্রত্যাখ্যান করিলেন, দেখিয়া লজ্জায় ক্ষোভে বিষাদে ম্রিয়মাণ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

(২)

এইরূপে ভগ্নমনোরথা পার্ব্বতী গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া যে দেহ-সৌন্দর্য্য দ্বারা শিবের মনোহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। রূপ কখন সার্থক হয়? যখন তাহা প্রিয়জনের প্রেম আকর্ষণ করিতে পারে। কিন্তু সে রূপ যতই সুচারু হউক তাহা কখনও স্মরহর মৃত্যুঞ্জয়ের চিত্ত বশীভূত করিতে পারিবে না, ইহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। সেই মৃত্যুঞ্জয়ের প্রেমলাভ করিবার জন্য তাঁহাকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সে উপায় কি? না তপস্যা। স্নেহময়ী মেনকা কন্যার এই কঠোর সংকল্পের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া কত প্রকারে নিষেধ করিলেন। "মা উমা, গৃহে যে সকল দেবতা আছেন, তুমি তাঁহাদের উপাসনা কর। তোমার কোমল শরীর কিছুতেই তপঃক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে না। কমনীয় শিরীষ-কুসুম ভ্রমরের পদভারই সহ্য করিতে পারে, পক্ষীর পদভার কেমনে সহিবে?" কিন্তু যে স্রোতস্বতী নিম্নাভিমুখে বহিয়া যায়, তাহার গতি কে ফিরাইতে পারে? সুতরাং উমা মেনকার নিষেধ মানিলেন না। পরন্তু গিরিরাজ সখীমুখে উমার মনোগত ভাব অবগত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে অভিলাষ-সিদ্ধির নিমিত্ত অরণ্যে গমন পূর্ব্বক তপস্যার অনুমতি প্রদান করিলেন।

তখন নগেন্দ্রনন্দিনী বক্ষের মুক্তাহার পরিত্যাগ করিয়া বালার্কারুণ বল্কল পরিধান করিলেন, মস্তকের মনোহর কেশপাশ

দ্বারা জটা বন্ধন করিলেন, কটিদেশে মুঞ্জমেখলা ধারণ করিলেন, এবং পরবর্ত্তীকালে যাহা তাঁহার নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল সেই গৌরীশিখর পর্ব্বতে গমন করিলেন। তাঁহার তনুতলার বিলাস-চেষ্টা বল্লরীর নিকট এবং নয়নের বিলোল দৃষ্টি হরিণীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তিনি মুনিব্রত ধারণপূর্ব্বক আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুকুমার করযুগল কুশাঙ্কুর-ছেদনে ক্ষতবিক্ষত হইল। তাঁহার যে সুকোল অঙ্গ বহুমূল্য দুগ্ধফেননিভ শয্যায় থাকিয়া কবরীচ্যুত-কুসুম-সংস্পর্শে ক্লেশবোধ করিত, তাহা এখন আস্তরণশূন্য ভূমিতল আশ্রয় করিল। তিনি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া কুম্ভনিষিক্ত বারিদ্বারা আশ্রম-বৃক্ষসকলের পুষ্টিসাধন এবং বনজাত নীবারাঞ্জলি দ্বারা আশ্রমমৃগগণকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সেই নিত্যস্নানরতা, বল্কল-বসনা, হোমক্রিয়াশালিনী, বেদপাঠকারিণী তাপসীর কঠোর তপস্যার কথা শুনিয়া ঋষিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবে সেই তপোবন অত্যন্ত পবিত্র হইল—সেখানে হিংস্রজন্তুগণ তাহাদের স্বভাব-বৈর পরিত্যাগ করিল, বৃক্ষগণ ইচ্ছানুরূপ ফলপুষ্প প্রদান করিয়া অতিথিসৎকার করিতে লাগিল, হোমাগ্নিগন্ধে পর্ণকুটীর নিরন্তর আমোদিত হইল। কিন্তু এইরূপ তপঃসাধন দ্বারা তাঁহার কাঙ্ক্ষিত ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত জানিয়া উমা আরও কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শরীর কাঞ্চনপদ্ম-নির্ম্মিত না হইলে, তিনি এত কঠোর মুনিব্রত ধারণ করিতে পারিবেন কেন?

তিনি গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিক অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া নেত্রপ্রতিঘাতিনী-প্রভামণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী সবিতার প্রতি বদ্ধদৃষ্টি হইয়া পঞ্চতপঃসাধন আরম্ভ করিলেন,—তাহাতে তাঁহার সুস্মিত মুখমণ্ডল কমলশ্রী ধারণ করিল, কিন্তু তাঁহার নয়ন-প্রান্তে কালিমা পড়িল। গ্রীষ্মাবসানে বর্ষার প্রথম-ধারাপাতে তাপক্লিষ্ট ধরা যেমন বাষ্প উদ্গীরণ করিয়াছিল, তাঁহার সূর্য্য ও অগ্নিতাপ দগ্ধ শরীরও সেইরূপ বাষ্প উদ্গীরণ করিতে লাগিল। তিনি নিরন্তর বাত্যাবৃষ্টিসমন্বিত রজনীতে যখন অনাবৃত স্থানে শিলাতলে শয়ন করিতেন, তখন তাঁহার সেই মহাতপস্যার সাক্ষিভূত হইয়াই যেন রাত্রি-সকল তড়িন্ময়নেত্র উন্মিলন করিত। পৌষমাসের নিশীথে যখন নিরতিশয় হিমশীতল বায়ু প্রবাহিত হইত, তখন তিনি জলমধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়া চক্রবাকমিথুনের বিরহার্ত্তনাদ শ্রবণে ব্যথিত হইতেন, এবং হিমপাতপ্রযুক্ত সরোবরের পদ্ম-সম্পৎ বিনষ্ট হইলেও তাঁহার কমলানন সেই অভাব পূরণ করিত। তপস্বিগণ বৃক্ষ হইতে স্বয়ং-পতিত-পত্রভক্ষণদ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া তপশ্চর্য্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, কিন্তু উমা গলিত পত্রও ভক্ষণ করিতে বিরত হইয়াছিলেন দেখিয়া পুরাণবেত্তারা সেই প্রিয়ম্বদা অদ্রিনন্দিনীর নাম অপর্ণা রাখিয়াছিলেন। এইরূপে উমা তাঁহার মৃণালপেলব শরীরের দ্বারা অহর্নিশ কঠোর ব্রত পালন করিয়া যে মহা-তপস্যা করিয়াছিলেন তাহা কৃচ্ছ্রসহিষ্ণু ঋষিগণের কঠোর তপস্যাকেও অতিক্রম করিয়াছিল।

(৩)

একদিন দণ্ডাজিনধারী সাক্ষাৎ ব্রহ্মচর্য্যমূর্ত্তি এক জটিল তপস্বী ব্রহ্মতেজে জ্বলিত হইয়াই যেন সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। উমা তাঁহার যথোচিত সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। সেই তপস্বী তাঁহার সৎকার-গ্রহণ-পূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া সরল-দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে পর্ব্বত-নন্দিনি! তোমার তপঃসাধন সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইতেছে ত? শরীর ধর্ম্মসাধনের প্রধান অবলম্বন জানিয়া তুমি শরীরকে নিরতিশয় ক্লেশ দিতেছ না ত? হে সৌম্যে! তোমার রূপানুরূপ শীল দর্শন করিয়া তপস্বীরাও যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতেছেন। তোমার বিশুদ্ধ-চরিত্রদ্বারা হিমালয় যেরূপ পবিত্র হইয়াছেন, সপ্তর্ষি-হস্তনিক্ষিপ্ত-হেমপদ্ম-পরিশোভিত মন্দাকিনীধারাদ্বারাও সেরূপ পবিত্র হন নাই। হে শোভনে! তুমি আমার যেরূপ সৎকার করিয়াছ তাহাতে আমাকে তোমার মিত্রজ্ঞান করাই উচিত। আমি চপল-স্বভাব ব্রাহ্মণ, আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, যদি গোপনীয় না হয় তবে তাহার উত্তর প্রদান করিয়া আমাকে আপ্যায়িত কর। তুমি আদি প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার শরীর ত্রিলোকসৌন্দর্য্যের ললামভূত, তোমার ঐশ্বর্য্যসুখ অত্যন্ত সুলভ, তোমার বয়সও নবীন—তুমি ইহার পরে আর কোন্ বস্তুর কামনা করিয়া এই কঠোর-তপস্যা করিতেছ? তুমি কি নিমিত্ত যৌবন-

কালে অঙ্গাভরণ পরিত্যাগ করিয়া বার্দ্ধক্যোচিত বল্কল ধারণ করিয়াছ ? সন্ধ্যাদেবী উজ্জ্বল চন্দ্রকিরীট ও তারকা-হার পরিত্যাগ করিয়া যদি অরুণের সহিত মিলিত হন তবে কি ভাল দেখায় ? তুমি যদি স্বর্গকামনা করিয়া থাক, তবে তোমার এই তপঃক্লেশ বৃথা ; কারণ তোমার পিতার প্রদেশবিশেষই দেবতাদিগের আবাসভূমি। আর যদি তুমি আত্মানুরূপ বর কামনা করিয়া থাক, তবে তাহার জন্যও তপস্যার প্রয়োজন নাই, কারণ রত্নকে লোকে অন্বেষণ করে—রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করে না। তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি কোন ঈপ্সিত পতিলাভের জন্যই এই কঠোর তপস্যা করিতেছ, কিন্তু তুমি যে যুবা-পুরুষকে মনে মনে পতিত্বে-বরণ করিয়াছ, না জানি সে কত কঠিন-হৃদয়,—নতুবা তোমার এই কঠোর তপস্যাতেও তাহার হৃদয়-বিগলিত হইতেছে না কেন ? তোমার শরীর অনাহারে শীর্ণ হইয়াছে—তোমার যে যে অঙ্গে অলঙ্কার ধারণ করিতে তাহা সূর্য্যের নিদারুণ উত্তাপে দগ্ধ হইয়াছে,—তোমার রূপ দিবাকালীন শশাঙ্ক-লেখার ন্যায় মলিন হইয়াছে—ইহা দেখিয়াও তাহার চিত্তে করুণার সঞ্চার হইতেছে না কেন ? আমার বোধ হইতেছে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহার সৌভাগ্যমদে বঞ্চিত হইতেছে। যাহাহউক, তোমার এই কঠোর-তপস্যা আর আমি দেখিতে পারিতেছি না। আমার নিজের ব্রহ্মচর্য্য-সঞ্চিত যে কিঞ্চিৎ তপঃ আছে, তাহারই অর্দ্ধাংশ তোমাকে অর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যে তুমি সত্বর অভীপ্সিত পতিলাভ

কর। তোমার সেই প্রার্থিত বর কে তাহা জানিতে বাসনা করি।”

ব্রহ্মচারীর বচন শ্রবণ করিয়া উমা তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী সখীকে তাঁহার মনোগতভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। সখী বলিলেন—“হে মহাভাগ! কাহার জন্য ইনি এই কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন। এই মনস্বিনী পর্ব্বত-নন্দিনী মহেন্দ্রাদি দিকপালগণকে উপেক্ষা করিয়া মদন-ধর্ষণকারী রূপবিতৃষ্ণ দেবাদিদেব পিণাকপাণিকে পতিরূপে লাভ করিতে অভিলাষিণী হইয়াছেন। ইনি কামদেব ভস্ম হওয়ার পর হইতে “হে নীলকণ্ঠ! কোথায় তুমি?” এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে যখন এই অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিতেন, তখন ইঁহার দুঃখ দেখিয়া কিন্নররাজকন্যারাও অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন। পরিশেষে বিনা তপস্যায় সেই জগৎপতিকে পতিরূপে লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই জানিয়া, পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এখানে আসিয়া তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সখী যেসকল বৃক্ষকে স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন, তাঁহার তপস্যার সাক্ষিস্বরূপ সেইসকল বৃক্ষের ফল জন্মিল, কিন্তু তাঁহার মনোরথসিদ্ধির অঙ্কুরোদ্‌গমও দেখা যাইতেছে না। জানি না আর কতদিন সেই প্রার্থিতদুর্লভ পরমপুরুষ ইঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। আমরা কিন্তু ইঁহার তপঃক্লেশ দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছি না।”

সখীর বাক্য শুনিয়া ব্রহ্মচারী কিছুমাত্র হর্ষলক্ষণ প্রকাশ না

করিয়া উমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইনি যাহা বলিলেন তাহা যথার্থ না পরিহাস ?"

তখন উমা করমুকুলে স্ফটিক-জপমালিকা জড়াইয়া মৃদুস্বরে সংক্ষেপে এইরূপ উত্তর দিলেন—"হে বৈদিকশ্রেষ্ঠ! সখী যাহা বলিলেন তাহা সত্য। এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি নিতান্ত দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়াই পিপীলিকার গিরিলঙ্ঘনের ন্যায় সেই উচ্চতম পদ লাভের প্রয়াসী হইয়াছে এবং তজ্জন্য যৎকিঞ্চিৎ তপঃসাধন আরম্ভ করিয়াছে, কারণ মনোরথের অগম্যস্থান কিছুই নাই।"

উমার বাক্যশ্রবণে ব্রহ্মচারী বলিলেন,—"হে গৌরি! তুমি যে মহেশ্বরকে পাইতে অভিলাষ করিয়াছ, আমি তাহাকে বিলক্ষণ চিনি। তাহার অমঙ্গলাচরণে আসক্তি জানিয়া তোমাকে আমি এ বিষয়ে উৎসাহিত করিতে পারিতেছি না। সেই মহাদেব সর্পকে বলয়ের ন্যায় হস্তে ধারণ করে, শোণিতবিন্দুবর্ষী গজাজিন পরিধান করে, শবকেশ-পরিব্যাপ্ত প্রেতভূমিতে বিচরণ করে, চিতাভস্ম গায় মাখে এবং বৃদ্ধ বলদের পৃষ্ঠে আরোহণ করে। বধূরূপে তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তুমি নিশ্চয়ই তাহার ললাটস্থ শশিকলার ন্যায় শোচনীয় দশাপ্রাপ্ত হইবে। তাহার আবার তিনটা চক্ষু, জন্মের কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না, ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পরিধেয় বস্ত্রের অভাবেই জানা যাইতেছে। ফলতঃ, হে মৃগলোচনে! বরের যে সকলগুণ থাকা বাঞ্ছনীয় তাহাতে তাহার একটিও নাই। অতএব হে ভদ্রে! তোমার ন্যায় পুণ্যলক্ষণা কন্যার হরের ন্যায় বরের সহিত পরিণয়-

প্রার্থনা করা নিতান্ত অসঙ্গত, তুমি সে সংকল্প পরিত্যাগ কর।”

ব্রহ্মচারীর বাক্যশ্রবণ করিয়া পার্ব্বতীর ক্রোধে অধর বিস্ফুরিত হইল, নেত্রপ্রান্ত ঈষৎ রক্তবর্ণ হইল এবং ভ্রূলতা আকুঞ্চিত হইল। তিনি বলিলেন,—“আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, হর যে কিরূপ বস্তু তাহা আপনি জানেন না। মূঢ় ব্যক্তিরা অলোকসামান্য মহাপুরুষের চরিত্র বুঝিতে অক্ষম বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকে। লোকে বিপৎপ্রতীকার অথবা ধনাকাঙ্ক্ষায় মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু যিনি জগতের শরণ্য, যাঁহার আকাঙ্ক্ষার কোন বিষয় নাই, তাঁহার আবার মঙ্গলানুষ্ঠান কি? তিনি অকিঞ্চন হইলেও সর্ব্বসম্পদের আকর —তিনি শ্মশানবাসী হইলেও ত্রিলোকের অধীশ্বর—তিনি ভীমরূপ হইলেও শিবরূপে পরিচিত—তাঁহার তত্ত্ব কে জানিতে পারে? তাঁহার শরীর কখন রত্নালঙ্কারে ভূষিত হয়, কখনও অহিবিজড়িত হয়—কখন গজাজিন-আচ্ছাদিত হয়, কখনও বা দুকূল-শোভিত হয়—কখন নৃকপাল ধারণ করে, কখনও বা ইন্দুকলা ধারণ করে; সেই বিশ্বমূর্ত্তি বিরাটপুরুষের শরীরের কে ইয়ত্তা করিতে পারে? চিতাভস্ম তাঁহার অঙ্গস্পর্শে নিশ্চয়ই পবিত্র হয়, নচেৎ যখন তাঁহার তাণ্ডবনৃত্যকালে জটাসঞ্চালনের দ্বারা বিয়দ্ব্যাপী গ্রহনক্ষত্রগণ বিপর্য্যস্ত হয় তখন তাঁহার দেহচ্যুত ভস্ম ইন্দ্রাদি দেবগণ সগৌরবে মস্তকে লেপন করেন কেন? সেই সম্পদ্-বিহীন মহাদেব বৃষভে আরোহণ করেন বটে, কিন্তু মদস্রাবী-ঐরাবতারূঢ়

দেবেন্দ্র তাঁহার মৌলিমন্দারপরাগে সেই শিবের চরণযুগল অরুণায়িত করেন। আপনি শিবের নিন্দা করিতে গিয়া বস্তুতঃ তাঁহার প্রশংসাই করিয়াছেন, কারণ যিনি স্বয়ম্ভু, যিনি ব্রহ্মারও আদিকারণ তাঁহার জন্মের পরিচয় কে দিতে পারে? যাহাহউক, আমি আর আপনার সহিত বিতণ্ডা করিতে ইচ্ছা করি না। শিব যেরূপই হউন আমার চিত্ত তাঁহার প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছে, তাহা অন্যের স্তুতিনিন্দার অপেক্ষা রাখে না। ওকি—আপনি আবার কি বলিতে যাইতেছেন? না—আমি আপনার আর কোন কথা শুনিব না। সখি! এই প্রগল্‌ভস্বভাব ব্রাহ্মণকে নিবারণ কর। মহাত্মাদিগের যে নিন্দা করে কেবল সেই পাপভাগ্ হয় এরূপ নহে, যাহারা সেই নিন্দাবাদ শ্রবণ করে তাহারাও পাপগ্রস্ত হয়। এস, আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই।"

এইকথা বলিয়া উমা যেই প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি ভগবান্ বৃষরাজকেতন স্বীয়মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তখন শৈলরাজসুতা তাঁহাকে দেখিয়া কম্পিত-কলেবরে স্বেদসিক্ত হইয়া গমনের জন্য যে পদ উত্তোলন করিয়াছিলেন, তাহা নিক্ষেপ করিতে না পারিয়া ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া রহিলেন—গিরিগাত্রসংঘাতে প্রতিরুদ্ধগতি বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় তিনি অগ্রসর হইতেও পারিলেন না, আবার পশ্চাৎ ফিরিতেও পারিলেন না,—"ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। "হে অনবদ্যাঙ্গি! অদ্য হইতে আমি তোমার ক্রীতদাস হইলাম, তুমি আমাকে তপস্যারূপ মূল্য দ্বারা

ক্রয় করিয়াছ”—এই কথা বলিয়া চন্দ্রশেখর তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। এইরূপে ত্রিজগতের জনকজননী আবার পুনর্ম্মিলিত হইলেন।

(৪)

সেই দেবাদিদেব পরমপুরুষকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য রূপযৌবনাদি দ্বারা লাভ করা যায় না, কিন্তু তপস্যারূপ মূল্যে তাঁহাকে ক্রয় করা যায়, মহাকবি কালিদাস সম্ভবতঃ এই তথ্যটি শিক্ষা দেওয়ার জন্য কুমারসম্ভব রচনা করিয়াছেন। কাব্যদ্বারা লোকশিক্ষা দেওয়ার কথা শুনিয়া কেহ কেহ হয়ত শিহরিয়া উঠিবেন। কারণ স্কুলমাষ্টারি করা কবির উদ্দেশ্য নহে—Art for art's sake—কাব্যকলার সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই একমাত্র উদ্দেশ্য—এইরূপ মত আজকাল শুনা যাইতেছে। ইহা অবশ্য পাশ্চাত্য মত, কিন্তু এই দেশের আলঙ্কারিকগণ কান্তার ন্যায় মধুরবাক্যে উপদেশ দেওয়া (“কান্তাসম্মিততয়া উপদেশযুজে”) কাব্যের একটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি মহাকবিগণও লোক-শিক্ষাকে কাব্যরচনার উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে বর্ত্তমানযুগের সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র বলেন,—

“কি এদেশে, কি সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিমধ্যে, অনেক পাঠকেরই এইরূপ সংস্কার যে, ক্ষণিক চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য নাই। বস্তুতঃ অধিকংশ কাব্যে (বিশেষতঃ গদ্যকাব্যে বা আধুনিক নবেলে) এই চিত্তরঞ্জন-প্রবৃত্তিই লক্ষিত হয়—তাহাতে

চিত্তরঞ্জন ভিন্ন গ্রন্থকারের অন্য উদ্দেশ্য থাকে না এবং তাহাতে চিত্তরঞ্জনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্তু সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না।"

*　　*　　*　　*　　*

"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে,—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি ব্যাখ্যাদ্বারা তাঁহার শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি-বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটী গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটী মুখ্য উদ্দেশ্য।" (বিবিধ প্রবন্ধ—উত্তরচরিত।)

এই কুমারসম্ভব কাব্যেও কালিদাস সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা লোকশিক্ষা দিয়াছেন।

এইরূপ লোকশিক্ষাদান কাব্যের উদ্দেশ্য হইলেও মহাকবি তাহা অতি উত্তমকৌশলে ব্যক্ত করিয়াছেন—যেন সহসা তাহা সকলের চক্ষে ধরা না পড়ে। কারণ লোকশিক্ষা তাহার গৌণ উদ্দেশ্য, তাহা সৌন্দর্য্যকলার মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এখানেই উৎকৃষ্ট শিল্পীর কৃতিত্ব।

কাব্যের প্রথমে কালিদাস শ্লোকের উপর শ্লোক রচনা করিয়া উমার রূপবর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিকই সেই ত্রিলোকের সৌন্দর্য্যরাশির আধার পরমাপ্রকৃতির রূপের কে ইয়ত্তা করিতে

পারে ? উমার সেই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তিকে আরও মনোমুগ্ধকর করিবার জন্য কবি তাহাকে একটি পরমরমণীয় পরিবেশ-মধ্যে স্থাপন করিলেন। কামদেবের আগমনে অকাল বসন্তের উদয় হইয়াছে—স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা প্রকৃতি হর্ষপুলকসঞ্চারে যেন জাগিয়া উঠিয়াছে। সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যশোভার বেষ্টনীমধ্যে অবস্থিত হইয়া উমার স্বাভাবিক রূপলাবণ্য সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইল। সেই রূপলাবণ্যময়ী হৈমবতী হরের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। হর তখন পরমাত্মায় সমাধিমগ্ন। সেই পরমপুরুষের আবার সমাধি কি ? তিনি আত্মাকে আত্মার মধ্যে অবলোকন করিতেছিলেন। তখন রূপরসাদি বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয় তাঁহার নিকট বিলুপ্ত। এই অবস্থায় চক্ষুরুন্মেলন করিয়া তিনি পার্ব্বতীকে দেখিয়া চিনিবেন কেন ? এই রূপলাবণ্যময়ী রমণী-কি সেই যোগিশ্রেষ্ঠ হরের অর্দ্ধাঙ্গিনী হইবার যোগ্যা ? ইনি কি তাঁহার সতী ? তাঁহার সতী যে দক্ষপ্রজাপতির অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে শ্মশানবাসিনী হইয়াছিলেন ! তাঁহার সতী যে দক্ষমুখে তাঁহার যোগিজীবনের নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন ! তাঁহার সতী যে সর্ব্বরূপ-বিবর্জ্জিতা—তাঁহার-সর্ব্বরূপ বিবর্জ্জিত সচ্চিদানন্দময় রূপের চিরসঙ্গিনী। সুতরাং মহাদেব এই অলোকসামান্য-রূপলাবণ্যময়ীকে চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন,—এবং তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে কন্দর্প বলপ্রয়োগে তাঁহার চিত্ত উমার প্রতি সমাসক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহাকে ক্রোধানলে ভস্মীভূত করিয়া

সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। মহাকবি মাত্র দুই একটি কথার দ্বারা এই সকল ভাব অতি কৌশলে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

"স্ত্রীসন্নিকর্ষং পরিহর্তুমিচ্ছ-
ন্নন্তর্দধে ভূতপতিঃ সভূতঃ ॥"

এস্থলে "ভূতপতিঃ" আর "সভূতঃ" এই দুইটি কথা লক্ষ্য করিতে হইবে। সেই বসন্তোৎসবোন্মত্ত প্রকৃতির মোহনলীলা-ভূমি বনস্থলী—সেই রূপ-লাবণ্যময়ী রমণীর চিত্তচাঞ্চল্যজনক সংসর্গ, যোগিশ্রেষ্ঠ মহাদেবের ভাল লাগিবে কেন? তিনি ভূতপতি—শ্মশানই তাহার প্রিয়স্থান এবং ভূতগণই তাঁহার সহচর! সুতরাং সেস্থান হইতে তিনি প্রস্থান করিলেন। আবার উমাও

"ব্যর্থং সমর্থ্যললিতং বপুরাত্মনশ্চ।"

অর্থাৎ নিজের দেহ-সৌন্দর্য্য ব্যর্থ হইল দেখিয়া পিতৃভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

উমা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন সেই যোগিশ্রেষ্ঠকে পতিরূপে লাভ করিতে হইলে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। তখন তিনি কি করিলেন?

"নিনিন্দরূপং হৃদয়েন পার্ব্বতী।"

মনে মনে নিজের রূপের নিন্দা করিলেন। এবং

"ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্যরূপতাং
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ।"

অর্থাৎ সমাধি অবলম্বন করিয়া তপস্যাদ্বারা শিবের প্রেম-লাভ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি তখন পিতার অনুমতি লইয়া গৌরীশিখর-পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তপস্যার খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল। ধর্ম্ম-বৃদ্ধ মুনিগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবে সেই আশ্রমের বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত প্রাণিগণ তাহাদের স্বভাব-বৈর পরিত্যাগ করিল। কিন্তু এরূপ তপস্যা ত অনেকেই করিয়া থাকে। এরূপ তপস্যাদ্বারা যোগিরাজ হরের চিত্তাকর্ষণ করা যাইবে কি? কখনই না। এরূপ তপস্যাদ্বারা অন্যান্য তপস্বিদের আকাঙ্ক্ষিত বর মিলিতে পারে, অষ্টসিদ্ধিলাভ হইতে পারে, কিন্তু যিনি হরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইতে বাঞ্ছা করেন,—যিনি হরের আত্মার সহিত নিজের আত্মা মিলাইয়া দিতে ইচ্ছা করেন—তাঁহাকে সেই হরের ন্যায়ই কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। তাই কবি বলিতেছেন—

"যদা ফলং পূর্ব্বতপঃ সমাধিনা
ন তাবতা লভ্যমমংস্ত কাঙ্ক্ষিতম্।
তদানপেক্ষ্য স্বশরীরমার্দ্দবং
তপো মহৎ সা চরিতুং প্রচক্রমে॥"

পার্ব্বতী যখন দেখিলেন যে, তিনি যেভাবে তপস্যা করিতেছেন তাহাতে তাঁহার অভীপ্সিত ফললাভের কোন আশা নাই, তখন তিনি আপন সুকোমল শরীরের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মহা-তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু তিনি তাহা পারিবেন কি? পারিবেন বৈ কি। তাঁহার শরীর যে কাঞ্চনপদ্মনির্ম্মিত ("ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চনপদ্ম-নির্ম্মিতং")—তাহা যেমন সুকুমার তেমন বজ্রসার। তাই তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিতপাঃ, শীতে জলনিমগ্না, নিরাহারা "অপর্ণা" হইয়া মহাতপস্যা করিলেন। সেই পরমপুরুষকে লাভ করিতে হইলে বুঝি মানবমাত্রেরই এইরূপ কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। একজন্মে নহে, দুই জন্মে নহে—শত শত জন্মের কঠোর তপস্যা ভিন্ন বিষয়াসক্তচিত্ত নরনারী সেই সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহের সম্মুখীন হইতে পারে না—কালিদাস কি এস্থলে এইরূপ ইঙ্গিত করিতেছেন?

যাহাহউক, পার্ব্বতীর কঠোর তপস্যায় এবার মহাদেবের করুণার সঞ্চার হইল। তিনি এবার পার্ব্বতীকে চিনিতে পারিলেন—"হাঁ—ইনিই আমার সেই সতী।" তাই তিনি ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া রহস্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এখানেও আবার পরীক্ষা। পার্ব্বতী যখন সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তখন মহাদেব স্বশরীরে দর্শন দিয়া বলিলেন,—

"অদ্য প্রভৃত্যানবতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ
ক্রীতস্তপোভিরিতি বাদিনি চন্দ্রমৌলৌ।"

হে সুন্দরি! তুমি আমাকে তপস্যাদ্বারা ক্রয় করিয়াছ—তোমার রূপের দ্বারা নহে ("অনবতাঙ্গি" সম্বোধন লক্ষ্য করিবেন) —অদ্যাবধি আমি তোমার দাস হইলাম।

রূপের দ্বারা ভগবানকে বাধ্য করা যায় না, তপস্যাদ্বারা তাঁহার করুণা আকর্ষণ করা যায় ইহাই মহাকবি কুমার-সম্ভবে শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত মাত্র দুই চারিটি কথাদ্বারা ধরা যায়, তাঁহার লোকশিক্ষার কৌশল কাব্য-সৌন্দর্য্যের অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া আছে। এখানেই মহাকবির অসাধারণ কৃতিত্ব।

সাহিত্যে মৌলিকতা।*

সকলের আগে একটা নূতন বস্তু দেখার গৌরবকে সাধারণতঃ মৌলিকতা বলে। "অমুক রাজা আজ নগরে বাহির হইয়াছিলেন এবং আমিই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে চিনিয়াছি" কোন কোন লোকের মধ্যে ইহা একটি বিশেষ গৌরবের কথা; ইহা এক শ্রেণীর মৌলিকতা। এক জন লোক পর্ব্বতের গুহা খনন করিতে করিতে খনি-গর্ভে নিহিত এক প্রকার মলিন মৃত্তিকামিশ্রিত ধাতু প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহা পরিষ্কার করিলে পীতোজ্জ্বল ভাস্বর সুবর্ণ-কণায় পরিণত হইল; ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর মৌলিকতা। এক জন স্পেনদেশীয় নাবিক আটলান্টিক মহাসাগরে জাহাজ ভাসাইয়া দিয়া একটি অজ্ঞাতপূর্ব্ব মহাদেশ আবিষ্কার করিয়া বসিলেন; ইহা তৃতীয় শ্রেণীর মৌলিকতা। আর একজন লোক খনি খুঁড়িতে খুঁড়িতে হঠাৎ এরূপ একটি বৃহৎ দীপ্তিমান পদার্থ প্রাপ্ত হইলেন যাহা রাজাধিরাজের কনক-মুকুটের শোভা বৃদ্ধির জন্ম প্রেরিত হইল; তাহার নাম হইল কোহিনুর। ইহা চতুর্থ শ্রেণীর মৌলিকতা।

রাজা যদি মাথায় মুকুট পরিয়া গজবাজিসৈন্য লইয়া রাস্তায় বাহির হন, তবে তাঁহাকে চেনার কোন গৌরব নাই। যে চক্ষু মেলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইবে সেই তাঁহাকে রাজা বলিয়া চিনিতে পারিবে। কিন্তু তিনি যদি রাজপরিচ্ছদ খুলিয়া সাধারণ

---

* ১৩১৪ সনের ফাল্গুন মাসের "ভারতমহিলা" পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

বেশে একাকী বাহির হন, তবে তাঁহাকে চিনিতে পারা একটা গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নাই। শিক্ষিত সমাজে যাঁহারা এইরূপে সাহিত্যজগতের সম্রাটদিগকে জনসাধারণের মধ্য হইতে চিনিয়া বাহির করিয়া লোকসমক্ষে প্রচার করেন তাঁহাদিগকে সমালোচক (critic) বলে; তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর মৌলিকতাসম্পন্ন।

সমালোচকের আবিষ্ক্রিয়া বহুল পরিমাণে নিজের শিক্ষা সাধনার উপর নির্ভর করে। তবে এ কথাও ঠিক, যে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সমালোচক হইতে পারেন না। বস্তুর দোষগুণ বিচারের একটি স্বাভাবিক শক্তি থাকে; তাহা সুশিক্ষা দ্বারা বিকশিত হয়। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই সেই শক্তি আছে একথা বলা যায় না। তবুও সমালোচকের মৌলিকতা অনেক পরিমাণে তাঁহার নিজের চেষ্টা ও উদ্যমের উপর নির্ভর করে। উহা পুরুষতন্ত্র ব্যাপার।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মৌলিকতা অর্থাৎ ভূ-তত্ত্ববিদের পর্ব্বতগহ্বর হইতে স্বর্ণের আবিষ্কার, ইহাও অনেকটা পুরুষতন্ত্র ব্যাপার সন্দেহ নাই। ইহাই বৈজ্ঞানিকের গবেষণা—original research. বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত তাঁহার বিজ্ঞানাগারে জড়পদার্থনিচয় ও যন্ত্রতন্ত্র লইয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিতেছেন; হয়ত এক দিন তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি অনেকগুলি পদার্থ পরীক্ষা করিতে করিতে তাহাদের মধ্যে আর একটি নূতন পদার্থ দেখিতে পাইলেন। অনেকগুলি যন্ত্রের নির্ম্মাণ-কৌশল পরীক্ষা করিতে করিতে আর

কটি নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। তাঁহার এই আবিষ্কার অনেক পরিমাণে তাঁহার অবিচলিত অভিনিবেশ ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফল। ইহাও পুরুষতন্ত্র ব্যাপার।

কলম্বসও নিজের দুর্দ্দমনীয় উৎসাহ-বশে মহাসাগরে জাহাজ ভাসাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই জাহাজ কোথায় গিয়া ঠেকিবে একথা তিনি একবারও কল্পনা করিতে পারেন নাই। পরে সেই জাহাজ ভাসিতে ভাসিতে যখন একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব মহাদেশে আসিয়া লাগিল তখন তিনি যেন একটি স্বপ্নরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এই আবিষ্ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ পুরুষতন্ত্র বলা যাইতে পারে না, ইহা কতক তাঁহার নিজের উদ্যমপ্রসূত, কতক দৈবাধীন।

কিন্তু যাঁহার হাতে কোহিনুর ধরা পড়িল, তাঁহার আবিষ্কার প্রায় সম্পূর্ণ দৈবাধীন। ইহাতে তাঁহার নিজের উদ্যম অতি অল্পই। জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজ্যে এই শ্রেণীর আবিষ্কারকের নাম দ্রষ্টা, ঋষি, কবি—Seer, Prophet, Poet. বাল্মীকি, কালিদাস—হোমর, সেক্ষপীয়ার—নিউটন, ফ্যারাডে এই শ্রেণীর আবিষ্কারক। ইঁহাদের আবিষ্কৃত রত্নরাজিই জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে। সেই সকল রত্নরাজি লইয়া সমালোচকগণ ও বৈজ্ঞানিকগণ সাধারণের ব্যবহারোপযোগী অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ করেন।

দ্রষ্টার আবিষ্কার দৈবাধীন বলিলাম কেন? ইহাতে কি তাঁহার কিছুমাত্র নিজের কর্ত্তৃত্ব নাই? কিছু কর্ত্তৃত্ব অবশ্যই আছে। তাঁহাকেও সময়োপযোগী শিক্ষা দ্বারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। যেরূপ শস্য ফলিবে সেইরূপ ক্ষেত্র চাই। সেক্ষপীয়ারের

ক্ষেত্রেই সেক্ষপীয়ার জন্মিয়াছিলেন, নিউটনের ক্ষেত্রে সেক্ষপীয়ার কিম্বা সেক্ষপীয়ারের ক্ষেত্রে নিউটন জন্মিতে পারিতেন না। দ্রষ্টার নিজ সংস্কারানুরূপ শিক্ষা দ্বারা হৃদয়াকাশ অরুণায়িত হইলে তবে তাহাতে জ্ঞান-সূর্য্যের উদয় হয়। দ্রষ্টাকেও শাস্ত্রানুশীলন-রূপ ঘট-স্থাপন করিয়া বাগ্‌দেবীর ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, পরে যদি কখনও দেবতার কৃপা হয় তবে তিনি তাঁহার চিত্তে উদ্ভাসিত হইতে পারেন। শিক্ষা ও শাস্ত্রানুশীলনের দ্বারা তাঁহার মনের কেন্দ্র (focus) ঠিক হয়, কিন্তু সেই কেন্দ্রে নূতন আলোকের আবির্ভাব হইবে কি না তাহা সেই আলোকদাতার ইচ্ছাধীন।

কবিবর শেলি বলিয়াছেন, আমাদের মধুর গান ঐগুলি, যাহাতে গভীরতম বিষাদ-কাহিনী সূচিত হয়। সেইরূপ বলা যাইতে পারে, আমাদের মৌলিক-তত্ত্ব ঐগুলি যাহাতে মানুষের নিজের কর্ত্তৃত্ব অত্যন্ত কম। যে ভাবগুলি অনেক ভাবনা চিন্তার পর বাহির হয় সে গুলিতে প্রায়ই মৌলিকতা থাকে না। কিন্তু যেগুলি মৌলিক ভাব (Original ideas). তাহাদের বিষয় একটুও চিন্তা করা হয় নাই, সে গুলি হঠাৎ বিজলি-চমকের মত চিত্তে প্রস্ফুরিত হয়, মনের কোন অজানা কোণ হইতে ক্রমাগত বাহির হইতে থাকে, আর ফুরায় না,—ঠিক বন্যার জলের মত সমস্ত চিত্তবৃত্তি ভাসাইয়া লইয়া বাহির হয়। তাই মৌলিক ভাবের একটি লক্ষণ তাহার স্বাভাবিক দ্রুত প্রবাহ। উহা প্রতি পদে আসে না, আসিয়া ভয়ে ভয়ে পিছনে ফিরিয়া দেখে না, কে কি মনে করিতেছে। অফুরন্ত গিরি-প্রস্রবণের ন্যায় তাহা অবিরাম ধারায় ধাবিত হয়।

ভাবগ্রস্ত দ্রষ্টা ঠিক ভূতগ্রস্ত রোগীর ন্যায়। অথবা মৃগের নাভিতে কস্তুরি জন্মিলে মৃগ যেমন ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়ায়, কি জন্য বেড়ায় সে তাহা জানে না; ভাবুকও সেইরূপ ভাবের মত্ততায় বিহ্বল হইয়া ছুটিয়া বেড়ান। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার ভিতরের ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ তিনি সুস্থ হইতে পারেন না। আবার যখন তিনি তাহা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি কি লিখিতেছেন, কেন লিখিতেছেন, তাহা জানেন না। কে এক জন ভিতর হইতে তাঁহার হাত ধরিয়া লেখাইতেছে, তাই তিনি লিখিতেছেন। সবটুকু শেষ হইলে তবে তিনি তাঁহার ভাবার্থ বুঝিতে পারেন! এইরূপে ভাবগ্রস্ত হইয়া আমাদের বর্ত্তমান সময়ের একজন দ্রষ্টা ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন, "আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী, আমি ঘর তিনি ঘরণী।" দ্রষ্টা যে ভিতরকার যন্ত্রীর যন্ত্র বিশেষ, দ্রষ্টার মৌলিকতা যে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না, এই ক-অক্ষর-বিবর্জ্জিত মহাপুরুষই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সাহিত্যের মৌলিকতা এইরূপ ভাবগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ। আবার বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বাবিষ্কারও কোন যন্ত্রীর যন্ত্র-ক্রীড়া বিশেষ। মানুষ ত হাজার হাজার বৎসর আগুন দিয়া জল গরম করিয়া আসিতেছে, কিন্তু সেই উত্তপ্ত জল হইতে যে বাষ্প উঠে, সেই বাষ্পের শক্তিতে রেলগাড়ী চলিতে পারে, এই তত্ত্বের আবিষ্কার কি মানুষের ইচ্ছায় হইয়াছিল? গাছের ডাল হইতে ফল বৃন্তচ্যুত হইয়া আকাশে উড়িয়া বেড়ায় না, তাহা মাটিতেই পড়ে, এ কথা

আগে কে না জানিত এবং এখনও কোন্ শিশু তাহা দেখে না? কিন্তু এই সূত্র ধরিয়া জগতের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার নিউটনের আগে কেহ করিতে পারে নাই কেন? তাহার কারণ, এই তত্ত্ব ধরিবার জন্য আর কাহারও মনের focus (কেন্দ্র) ঠিক হয় নাই। যেই নিউটনের মনের কেন্দ্র সেই সর্ব্বজ্ঞানভাণ্ডার আলোক-কেন্দ্রের সহিত যুক্ত হইল, অমনি তাঁহার মনের মধ্যে এই তত্ত্ব উদ্ভাসিত হইল। এইরূপে বিশ্বের কেন্দ্রস্বরূপ একমাত্র যন্ত্রীর দ্বারা পরিচালিত হইয়া সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এক একটি নব নব ভাব, নব নব তত্ত্ব দ্রষ্টৃগণ জগতে প্রচার করিতেছেন। সেই পুরাণ পুরুষই একমাত্র আদি কবি, আদি শিল্পী, বিশ্বকর্ম্মা। তাঁহার নিকট ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান একমাত্র বর্ত্তমান। তাঁহার ক্রীড়ার যন্ত্রও সর্ব্বকালে বিদ্যমান। সুতরাং নূতন ভাব, নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের যুগ চলিয়া গিয়াছে, আর আসিবে না, এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে না।

কিন্তু বাস্তবিকই কোন কোন ব্যক্তি এরূপ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে সাহিত্যে মৌলিকতার যুগ চলিয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যে মৌলিকতার অর্থ পূর্ব্বসঞ্চিত ভাবরাশি লইয়া নাড়া-চাড়া করা। এখনকার দিনে নাকি যিনি যত বড় পণ্ডিত (scholar) তিনিই তত অধিক মৌলিক তত্ত্ব উদ্ভাবনে অধিকারী। মৌলিকতাকে যদি শুদ্ধ পাণ্ডিত্যের বাটখারায় ওজন করিতে হয় তবে আমার মতে মৌলিকতার অবমাননা করা হয়। আজ-

কালকার দিনে কোন দেশেই পণ্ডিতের অভাব নাই, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয় জন মৌলিকতাসম্পন্ন?

আর একজন বলেন, মৌলিক ভাব বা মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞান-বিজ্ঞানরাশি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা আবশ্যক। যিনি মূল তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রয়াসী, তাঁহাকে নাকি জগতে পূর্ব্ব-সঞ্চিত সাহিত্য-বিজ্ঞানের স্তূপে আরোহণ করিয়া তদুপরি তাঁহার নূতন ইট বসাইতে হইবে। আমি বলি, এ কাজ সেই ইষ্টক-নির্ম্মাতার নহে, এ কাজ সৌধশিল্পীর। জ্ঞান-বিজ্ঞান-রাজ্যে যিনি নূতন ইট প্রস্তুত করেন তিনি ইট প্রস্তুত করিয়াই খালাস। সে ইট নূতন কি পুরাতন ইহা বিচারের অবকাশ তাঁহার নাই। তিনি শুক্তির ন্যায় মুক্তা প্রসব করিয়া যাইবেন—সে মুক্তা আসল কি নকল সাহিত্যের বাজারে তাহার মূল্য কত ইহা সমালোচকগণ বিচার করিবেন।

আর, কোন এক জনকে মৌলিক লেখক বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে তাঁহাকে যদি পৃথিবীর যেখানে যিনি যাহা লিখিয়া-ছেন তাহা সমস্ত আয়ত্ত করিয়া কলম ধরিতে হয়, তবে কাহারও ভাগ্যে এই যশঃ ঘটিবে কি না সন্দেহ। জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার অনন্ত, মানুষের আয়ু সামান্য। জগতে আর কেহ কখনও যাহা ভাবে নাই, আমি তাহা ভাবিয়াছি—জগতে আর কেহ কখনও যাহা লেখে নাই আমি তাহা লিখিয়াছি, এইরূপ গর্ব্ব মৌলিকতার অর্থ নহে। সেক্ষপীয়ারের হ্যামলেটের ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্যে যদি একটি নাটকীয় চরিত্র বিদ্যমান থাকিত, তবে হ্যামলেটকে কি

মৌলিক চরিত্র বলিতাম না? আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র যদি প্রকৃতই তাঁহার আয়েষা-চরিত্র আইভ্যান্‌হো উপন্যাস পাঠ করিবার পূর্ব্বে কল্পনা করিয়া থাকেন, তবে আয়েষাকে কি মৌলিক চরিত্র বলিব না? মৌলিক ভাব দেশকাল দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। তাহা একই প্রণালীতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কবি-হৃদয়ে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বতন-সাহিত্যানুশীলন মৌলিক ভাব বিকাশের জন্য একান্ত আবশ্যক না হইলেও অনেক সময়ে তাহার সহায়তা করে। সেই সহায়তা-লাভের জন্য সাহিত্যানুশীলন আবশ্যক। স্বয়ং সেক্ষ-পীয়ারও গ্রীক এবং রোমান ইতিহাসাদি প্রাচীন সাহিত্য হইতে তাঁহার নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই জন্য সেক্ষপীয়ারের মৌলিকতার উপর কেহ দোষারোপ করিবে ভয়ে ইমারসন্ তাঁহাকে সমর্থন করিয়া কত কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে তাঁহার এ কারণে এত বাক্যব্যয় করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমাদের দেশের কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ কবিগণ রামায়ণ ও মহাভারতের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে তাঁহাদের কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন নাই। কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা মহাভারতের শকুন্তলার সহিত তুলনায় একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চরিত্র-চিত্র। এই সকল মহাকবি স্বীয় প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক-পাতে পুরাতনকে সম্পূর্ণ নবীন জীবন দান করিতে সমর্থ। তখন সেই পুরাতন চিত্রকে আর পুরাতন বলিয়া চেনা যায় না। এখানেই কবির মৌলকতার

বিকাশ। অতএব সেই পুরাতনের অবলম্বনে এই নূতন সৃষ্টিও মৌলিকতা।

এইরূপে পুরাতনের অনুকরণে নূতন সৃষ্টিও আর এক শ্রেণীর মৌলিকতা। একটি চিত্র দেখিয়া সেইরূপ আর একটি নির্ম্মাণ করাতে যে মানসিক উৎকর্ষের আবশ্যক, তাহাও সাহিত্য-জগতে দুর্ল্লভ। এরূপ সৃষ্টি-সামর্থ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে শেষের কবি ও পূর্ব্বতন কবি প্রায় সমান শক্তিবিশিষ্ট। প্রথম কবির চিত্তে সেই চিত্রটি দৈবানুগ্রহে স্ফুরিত হইয়াছিল, শেষোক্ত কবি তাহা নিজের সাধনবলে সৃষ্টি করিয়াছেন। একটা ভাব কেবল স্ফুরিত হইলেই হইল না, তাহাকে রক্ত মাংসের শরীর দিয়া জীবন্ত করিয়া গঠন করাতেই বেশী কৃতিত্ব। এই হিসাবে, অনুকরণশীল কবিকে সাধারণতঃ যতটা নিন্দার পাত্র মনে করা যায়, বাস্তবিক তিনি ততটা নিন্দার পাত্র নহেন।

আমাদের বঙ্গসাহিত্যে এই শ্রেণীর মৌলিকতা কিছু বেশী হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। এক একটি প্রকৃত দ্রষ্টা বা কবি বৎসর বৎসর জন্মগ্রহণ করেন না, কোন যুগে এক আধটি আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের একটি অন্তর্হিত হইলে আর একটির আবির্ভাব পর্য্যন্ত আসর কি একেবারেই খালি থাকিবে? তাই স্বভাবের নিয়মে তাঁহাদের একটির তিরোধানের পর তাঁহার মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহার প্রভাবে অনুপ্রাণিত অনেক গুলি শিষ্য-প্রশিষ্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাঁহারাই অন্য মহাপুরুষের আবির্ভাবকালপর্য্যন্ত

সাহিত্যের দীপশিখা প্রজ্বলিত রাখেন। তাঁহারা পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের রত্নরাজি দ্বারা নূতন নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে থাকেন। এইরূপ মহাপুরুষের তপস্যালব্ধ মৌলিক ভাব সকল বিবিধ বেশে, বিবিধ আকারে জনসমাজে প্রবাহিত হইয়া সাধারণের মানসিক উৎকর্ষ ও সাংসারিক সুখ-সুবিধার বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এইরূপে এক একটি দ্রষ্টার আবির্ভাবের পর জনসমাজ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে এক একটি স্তরে উত্থিত হইয়া পরিশেষে পূর্ণতা লাভ করে। ইহাই সাহিত্য-সৃষ্টির চিরন্তন নিয়ম।

সর্ব্বানন্দের সিদ্ধিলাভ।*

সাধকপ্রবর স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কোন গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যেমন মৃগনাভি কস্তুরী কোন পাত্রে বহুদিন রাখিয়া পরে তাহা তুলিয়া লইলেও সেই পাত্রটি অনেক কাল যাবৎ সুস্নিগ্ধ কস্তুরীগন্ধে আমোদিত থাকে, সেইরূপ কোন সাধক যেস্থানে সিদ্ধিলাভ করেন তাঁহার তিরোভাবের অনেক কাল পরেও সে স্থানটিতে সেই মহাপুরুষের তপস্যার শান্তিময় পুণ্য প্রভাব অনুভব করা যায়। বিখ্যাত শক্তিসাধক সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের সিদ্ধিপীঠ মেহার-ক্ষেত্রে যাইয়া আমি এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া-ছিলাম। এই মহাত্মার সিদ্ধিমাহাত্ম্যে মেহার হিন্দুর একটি পবিত্র তীর্থে পরিণত হইয়াছে। সেই তটদ্রুমশালি-বিশাল-সরোবর-শোভিত,উন্মুক্তপবন-নিষেবিত, লোক-কোলাহল-বিরহিত স্নিগ্ধছায়া-বহুল শান্তিময় স্থানটি বড়ই মনোরম এবং সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়াই বোধ হয়। মেহার গ্রামটি ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত, চাঁদপুর ষ্টেসন হইতে ১৪ মাইল এবং ভিঙ্গরা ষ্টেসন হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। ৺শারদীয়া পূজার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত এখানে এই অঞ্চলবাসী বহুলোকের সমাগম হয়। পৌষসংক্রান্তির দিন এখানে একটি বড় মেলা হয়। ঐ দিন ৺সর্ব্বানন্দ ঠাকুর এস্থানে একটি জীনতরুমূলে দশমহাবিদ্যারূপ প্রত্যক্ষ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। এখন জীনবৃক্ষ

---

*"বঙ্গভাষা" পত্রিকা দ্বিতীয় ভাগ, ৫ম সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

নাই, তাহার অস্তিত্বের কোন চিহ্নও নাই। ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসের ঝড়ে নাকি তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এখন সেই পীঠ-স্থলীতে কয়েকটি প্রাচীন বহুশাখাসমাকীর্ণ বিশাল অশ্বথ ও বটবৃক্ষ স্নিগ্ধছায়া বিতরণ করিতেছে। ৺ মেহারেশ্বরী কালীমাতার অর্চ্চনা সেই বৃক্ষমূলেই করিতে হয়—এখানে দেবীর কোন প্রতিমা নাই।

মহাত্মা সর্ব্বানন্দ যে সময়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেন, সে আজ প্রায় চারিশত বৎসরের কথা। এখন তাঁহার বংশাবলী ষোড়শ-পুরুষ পর্য্যন্ত নামিয়াছে। তাঁহার পুত্র শিবনাথ ভট্টাচার্য্য "সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিনী" নামক তাঁহার একখানা জীবনাখ্যায়িকা রচনা করেন। এই গ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে ইহা বঙ্গানুবাদ সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে আমি সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের সিদ্ধিবিবরণ এই প্রবন্ধে প্রকটিত করিব।

পূর্ব্বকালে মেহারে দাসবংশীয় এক রাজা ছিলেন। সর্ব্বানন্দ ঠাকুর তাঁহার গুরুবংশীয় ছিলেন। একদিন কাশীবাসী কোন দণ্ডী ৺ চন্দ্রনাথতীর্থে গমন উপলক্ষে মেহারে আসিয়া উপস্থিত হন। দাসরাজা তাঁহাকে বারাণসীধাম পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে দণ্ডী বলিলেন, "মহাশয়! আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলিব? একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ অবধূত-বেশে কাশীধামে আসিয়াছেন, তিনি বড়ই দুরাচার, মদ্যমাংস ভিন্ন আহার করেন না। আমরা কাশীবাসী দণ্ডিগণ তাঁহার এই কদাচার দেখিয়া তাঁহাকে খুব তাড়না করি। কিন্তু মহাশয়!

দুঃখের কথা কি বলিব, সেই দিন হইতে আমরা যাহা কিছু খাইতে ইচ্ছাকরি তাহাই মদ্যমাংসময় দেখি। সেই দুঃখে আমরা পুণ্যধাম বারাণসী ত্যাগ করিয়া এখন নানা তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।"

দণ্ডীর কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন—"কি সর্ব্বনাশ! আপনি আমার গুরুদেবের নিন্দা করিতেছেন! তিনি আর কেহই নহেন, তিনি একজন মহাপুরুষ। তিনি ভগবতীর দশমহাবিদ্যারূপ প্রত্যক্ষ করিয়া মহাসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।"

দণ্ডী বলিলেন—"বটে? তিনি যে একজন এতবড় মহাপুরুষ তাহা ত জানিতাম না। আচ্ছা, তিনি কোন্ তপস্যাবলে মহামায়াকে সাক্ষাৎদর্শন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন।"

রাজা তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন :—

পূর্ব্বস্থলী-নিবাসী বাসুদেব নামক একজন ভক্ত ব্রাহ্মণ ভগবতীর দর্শনাভিলাষে গঙ্গাতীরে মন্ত্রজপ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি দৈববাণী হইল "তুমি মেহার দেশে যাইয়া নিজ পুত্রের ঔরসে জন্মগ্রহণ কর—সেখানে মাতঙ্গমুনির আশ্রমে যে গুপ্ত মহালিঙ্গ আছেন, তাঁহার উপরে শবারূঢ় হইয়া সাধন কর, তবে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।" এই দৈববাণী শুনিয়া বাসুদেব মেহারে আসিয়া বাস করিলেন এবং কিছুদিন পর কামাখ্যায় উৎকট তপস্যা করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। পূর্ণানন্দ নামে তাঁহার একটি শূদ্র-জাতীয় বিশ্বাসী ভৃত্য ছিল, তাহার নিকট তিনি এসকল কথা খুলিয়া বলিয়াছিলেন। বাসুদেবের পুত্রের নাম ছিল শম্ভুনাথ।

তিনি সেই শম্ভুনাথের ঔরসে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলেন। তখন তাঁহার নাম হইল সর্ব্বানন্দ।

ক্রমে সর্ব্বানন্দ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধির বড় কেহ প্রশংসা করিত না। এমন কি তিনি ক-অক্ষর-বর্জ্জিত হইলেন। একদিন রাজসভায় তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, "ঠাকুর! বলত আজ কি তিথি?" সর্ব্বানন্দ বলিলেন "পূর্ণিমা।" বাস্তবিক সে দিন ছিল অমাবস্যা। তাঁহার এই উত্তর শুনিয়া রাজা ও তাঁহার পারিষদবর্গ ক্ষুব্ধ হইলেন। রাজা তাঁহাকে স্পষ্ট বলিয়া-দিলেন "ঠাকুর! তোমার ন্যায় মহামুর্খ আমি আর কোথাও দেখি নাই। তুমি আর আমার সভায় আসিও না।"

সর্ব্বানন্দ বাড়ী আসিলেন। সেখানেও তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-ভ্রাতা প্রভৃতি তাঁহাকে বিশেষরূপে ভর্ৎসনা করিলেন। তাঁহার মনে বড়ই দুঃখ হইল। তিনি বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য সেই দিনই গৃহত্যাগ করিয়া বনগমন করিলেন। সেকালে তালপত্রে বিদ্যা-রম্ভ করিতে হইত। তিনি সেই তালপাতা কাটিবার জন্য একটি তাল-বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। সেই গাছের মাথায় একটা ভয়ানক সাপ ছিল। তিনি তাহাকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত ও বিচলিত না হইয়া, এক হাত দিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিলেন, অন্য হাতে দা দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে সেই বৃক্ষতলে একজন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া ছিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি গাছে চড়িয়া কি করিতেছ? তোমার ত খুব ভয়ানক সাহস দেখিতেছি। তুমি নামিয়া এস।"

সর্ব্বানন্দ তালগাছ হইতে নামিলেন। নামিয়া দেখিলেন সম্মুখে বিভূতিভূষণ, জটামণ্ডিত-মস্তক, রক্তবস্ত্রপরিধান, হাস্যানন এক-জন অবধূত দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তালগাছে চড়িয়া কি করিতেছিলে?" তিনি বলিলেন, "ঠাকুর! আমাকে সকলে মূর্খ বলিয়া ঘৃণা করে, আমি বিদ্যাশিক্ষা করিব বলিয়া তাল-পাতা কাটিতে গাছে চড়িয়াছিলাম।" সন্ন্যাসী বলিলেন "বাপু! তোমার লেখাপড়া শিখিয়া কোন কাজ নাই, আমি তোমার কাণে যে মন্ত্র দিতেছি, ইহা জপ করিয়া সাধন কর, তোমার সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" তিনি আরও বলিলেন :—

"মেহারে জীনমূলে বিবিধতমোদ্বৃতে পৌষমাসশসাঙ্গান্তে
শুক্রে রাত্রার্দ্ধভাগে ত্রিভুবন-জননী যাপ্রকাশা প্রকাশা।
ধ্যায়ন্ তাং যোগগম্যাং শব হৃদি প্রবিশন্ মূল-মন্ত্রং প্রজপেৎ
সর্ব্বাশাপূর্ণকামো মনোনীত-বরদা সুপ্রসন্না ভবেৎসা॥"

অর্থাৎ মেহারে একটি জীন বৃক্ষমূলে পৌষসংক্রান্তি-দিবসে শুক্রবারে অমানিশায় রাত্রি দ্বিপ্রহরে অপ্রকাশা জগন্মাতা সুপ্রকাশিতা হইবেন। তুমি শবারূঢ় হইয়া এই মন্ত্রজপ করিবে। সেই বাঞ্ছাকল্পলতিকা দেবীর বরপ্রসাদে তোমার সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হইবে।

সর্ব্বানন্দ অবধূতের নিকট এই উপদেশলাভ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাদের প্রাচীন ভৃত্য পূর্ণানন্দকে সব কথা বলিলেন। পূর্ণানন্দ ত পূর্ব্ববিবরণ সমস্তই অবগত ছিলেন।

তিনি যে শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহা সমাগত দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পরে তিনি যথাসময়ে সর্ব্বানন্দকে লইয়া মাতঙ্গমুনির আশ্রমে জীনবৃক্ষমূলে গমন করিলেন। তিনি সর্ব্বানন্দকে বলিলেন, "ভাই! তোমার কোন ভয় নাই, এই আমি শুইয়া পড়িলাম, তুমি আমার পৃষ্ঠে চাপিয়া বসিয়া তোমার সেই মন্ত্র জপ কর। যদি কোন দেবতা তোমাকে বর দিতে আসেন, তবে বলিও—'আমি সে সব কিছু জানি না, আমার পুনা দাদা জানে'।" এই বলিয়া সেই প্রভুহিতৈকপ্রাণ ভৃত্য প্রভুর হিতকামনায় তাহার অজ্ঞাতসারে নিজের মস্তক ছেদন করিলেন। পূর্ণানন্দ! তুমি ধন্য!—তুমি যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, তাহাও তোমার এই অক্ষয় কীর্ত্তির জন্য ধন্য!

ঘোর অমানিশা। গাঢ় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত। সেই নিবিড় তমোরাশি কাননের বৃক্ষচ্ছায়ার সহিত মিলিত হইয়া আরও গাঢ় হইয়াছে। নিশীথিনীর গভীর-নিস্তব্ধতাভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে বন্যজন্তুর কণ্ঠধ্বনি শুনা যাইতেছে। উত্তরদিক্ হইতে হিমানীসম্পৃক্ত প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু সর্ব্বানন্দের কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য। তিনি অবিচলিতচিত্তে ইষ্টমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতেছেন। তাঁহার দেহকে অরণি এবং দেবীপ্রণবকে উত্তরারণি করিয়া তিনি দেবীমূর্ত্তিধ্যানরূপ মন্থন অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তখন হঠাৎ সেই অরণিদ্বয়ের সংঘর্ষণে তাঁহার হৃদয়-পদ্মে

প্রদীপ্ত-বহ্নির ন্যায় তেজঃ অনুভব করিলেন (১)। সেই নিষ্কল শুভ্র পরম তেজঃ তাঁহার হৃদয় হইতে বিনির্গত হইয়া চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নি-তুল্য উজ্জ্বলতায় তমোব্যাপ্ত বনভূমি আলোকিত করিল। সর্ব্বানন্দ নির্নিমেষ-নয়নে সেই তেজোমণ্ডল দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই তেজোরাশি তাঁহার গুরূপদিষ্ট ইষ্টদেবতার মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। তখন সর্ব্বানন্দ সবিস্ময়ে দেখিলেন,—জগজ্জননীর সেই নবাম্বুদ-শ্যামরুচির চারুমূর্ত্তি গগনভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে—তাঁহার নিবিড়-বিগলিত, কুঞ্চিত-চিকুর-জালে আকাশের তারকারাজি আচ্ছাদিত হইয়াছে—তাঁহার চন্দ্রসূর্য্যপ্রভ দিব্যদেহচ্ছটা সেই অমানিশীথিনীর ঘোর তমোরাশি দূরীভূত করিয়া গ্রহগণের কক্ষায় কক্ষায় বিচ্ছুরিত হইয়া তাহাদিগকে নির্ব্বাপিত করিয়া দিতেছে। তখন,—

"তন্মূর্ত্তিঃ পরমারূপা মহতী ভক্তবৎসলা।
ঈষদ্ধাস্যাম্বুজমুখী নীলেন্দীবরলোচনা॥
সদা দয়ার্দ্রহৃদয়া সাধকাভীষ্টসিদ্ধিদা।
ভক্তানাং কুশলাকাঙ্ক্ষী (?) শান্তানাং শান্তিদায়িনী।
জবাকুসুমসঙ্কাশা চন্দ্রকোটী-সুশীতলা।
পদ্মাননা পদ্মহস্তা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিলোচনা।
ত্রৈলোক্যজননীনিত্যা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদা।"

---

(১) "স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যান-নির্ম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবংপশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥"
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

সর্ব্বানন্দকে বলিলেন,—

"বৎস! আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।"

সর্ব্বানন্দ তখন ভক্তিগদগদচিত্তে শবাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই ভক্তবৎসলা জননীর স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবতীর কৃপায় সেই মূর্খের মুখ হইতেও নানা-গভীরভাবার্থযুক্ত ভক্তিরসস্নিগ্ধ এক বিচিত্র স্তোত্রলহরী উচ্ছ্বসিত হইল।

দেবী সেই স্তব শুনিয়া বলিলেন, "বৎস! আর স্তবে প্রয়োজন নাই, এখন তোমার মনোগত বর প্রার্থনা কর।"

সর্ব্বানন্দ বলিলেন, "মা! তোমার বিধিবিষ্ণুশিববাঞ্ছিত চরণ-কমলযুগল যে আমি দর্শন করিলাম, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। আমি আর কি বর চাহিব? যদি একান্তই তোমার বর দিতে অভিলাষ হয়, তবে আমার এই পুণ্য দাদাকে জিজ্ঞাসা কর আমি সে সব কিছু জানি না।"

তখন দেবী তাঁহার পরমপদস্পর্শে পূর্ণানন্দকে তাঁহার সেই চিরনিদ্রা হইতে জাগাইয়া বলিলেন—"বৎস! আমি তোমার প্রতিও তুষ্ট হইয়াছি। এখন বর প্রার্থনা কর।"

পূর্ণানন্দ সেই হৃদয়ারাধ্য পরমবস্তুকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনিও ভক্তিগদগদচিত্তে তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন। জগতের সারাৎসার তত্ত্বকথা সকল তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইতে লাগিল। স্তব শেষে বলিলেন—"মা!

আমাদের প্রতি যদি তোমার একান্তই করুণা হইয়া থাকে, তবে আমাদিগকে তোমার সেই দশবিধ মহামূর্ত্তি দেখাও।"

তখন ভক্তবৎসলা জননী তাঁহাদিগকে তাঁহার দশমহাবিদ্যা রূপ দেখাইলেন।

সেই সকল রূপ-দর্শনে মোহিত হইয়া সর্ব্বানন্দ ও পূর্ণানন্দ ভাববিহ্বলচিত্তে পুনর্ব্বার দেবীর স্তব করিলেন। তাঁহাদের এই স্তবটি বড়ই মনোহর, সে জন্য তাহা এথানে উদ্ধৃত করিলাম।

সর্ব্বানন্দ উবাচ।

ঘনাকারাকারা রিপুরুধিরধারাঙ্কিতমুখী
গলদ্বেণীভারা গলললিতহারা হরবধূঃ।
উদারা দুর্ব্বারা সুরগণবিহারা সুরসনা
ময়া মেহারে সা ভুবনজননী দর্শনমিতা॥

পূর্ণানন্দ উবাচ।

বিধাত্রাদেরম্বা সুরতরু নিতম্বোঽম্বুজমুখী
সুরস্তাগুস্তোরুঃ স্তনতুলিতকুম্ভোঽঞ্জননিভা।
জগত্তারা সারা রচিতময়কারাভয়হরা
ময়া মেহারে সা ভুবনজননী দর্শনমিতা॥

সর্ব্বানন্দ উবাচ।

অসুররক্ত-গলিতবক্ত্-চলদলক্তরাগিণী
ধরণীলিপ্ত-কুটিলমুক্ত-চিকুরনক্ত-কারিণী।
কলিতখণ্ড বিকৃতচণ্ড দনুজমুণ্ডমালিনী
বিগতবস্ত্র নিশিতশস্ত্র কুণপমুণ্ড ধারিণী॥

শতশুভঙ্করি শবশিরোধরি
রিপুভয়ঙ্করি রণদিগম্বরি।
জলদরূপিণি সমরনাদিনি
মদবিমোহিনী দ্বিরদগামিনী ॥

পূর্ণানন্দঃ।

নিশিতসায়কাসুর বিদারিণী
হিমগিরীশজাহ্নচলনিবাসিনী ;
ভবসরিশুরি গিরিশকামিনী
চরণনূপুরধ্বনি-বিনোদিনী ॥

সর্ব্বানন্দঃ।

জগদুপদ্রব-ব্রজ-বিভাবরী
শতদিবাকর-পরমসুন্দরী।
অনিভৃতজ্বলৎ-কুটিলকুন্তলা
শবকরাবলি-ধৃতকটিস্থলা ॥

পূর্ণানন্দঃ।

দেবদনুজাদি রণভীত-রসনোজ্জ্বলা
ভীমতর-দৈত্যকরবদ্ধ-কটিমেখলা।
কণ্ঠপরদত্ত (?) নর-মুণ্ডচয়মালিনী
সৈবমম চেতসি বিভাতি কুলকামিনী ॥

সর্ব্বানন্দঃ।

সব্যকরসায়ক সুরারি কুলঘাতিনী
করধনরাব-রব-ঘোরতর-নাদিনী।

দেবপশুনাথ শববক্ষসি বিরাজিতে
দেহি তব পাদযুগ ভক্তিমুক্তিহীনকে ॥
শতকোটি-দিবাকর কান্তিযুতং
বিধিবিষ্ণু-শিরোমণি-রত্নযুতং।
চলদুজ্জ্বল-নূপুরগানযুতং
জগদীশ্বরি তারিণি তে চরণম্ ॥

পূর্ণানন্দঃ।

বিষয়ানলতাপিত তাপহরং
বিধিশৌরি-মহেশ-বিধান-করং
শিবশক্তিময়ং ভয়নাশকরং
জগদীশ্বরি তারিণি তে চরণম্ ॥

সর্ব্বানন্দঃ।

কুসুমাকরশীকর-দূসরিতং
মদমত্ত-মধুব্রত-গুঞ্জরিতং
জগদুদ্ভব-পালন-নাশকরং
জগদীশ্বরি তারিণি তে চরণম্ ॥

স্তবশেষে পূর্ণানন্দ এই বর প্রার্থনা করিলেন। 'মা! যাঁহাদের সেবা দ্বারা আমি এই অধম শূদ্রতনয় তোমার ঐ দেববাঞ্ছিত পদ-যুগল প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইলাম, সেই সর্ব্বানন্দবংশের ভক্তি যেন তোমার পাদপদ্মে অচলা থাকে। আর যে মহামন্ত্র জপ দ্বারা সর্ব্বানন্দ সিদ্ধিলাভ করিলেন, তাহা যেন কখনও অরিচক্রে পতিত না হয়। তোমার নিজ দাস সর্ব্বানন্দ মূর্খতাবশতঃ অমাবস্যাকে

পূর্ণিমা বলিয়া ফেলিয়াছেন, তোমার শ্রীচরণ মহিমায় তাঁহার সেই বাক্য সার্থক হউক।" দেবী তাঁহাদিগকে এই অভীষ্ট বর প্রদানান্তে স্বীয় নখেন্দু প্রদর্শন করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

দাসরাজার মুখে সর্ব্বানন্দের এই সিদ্ধিবৃত্তান্ত শুনিয়া দণ্ডী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, সর্ব্বানন্দ ত এইরূপে নির্জ্জনে সিদ্ধিলাভ করিলেন, আপনারা তাহা জানিলেন কিরূপে?"

রাজা বলিলেন, "সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। সেই অমাবস্যা রজনীতে আমার পুরবাসিগণ আকাশে মৃগকলঙ্কবিহীন পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। আর তাহার পর হইতেই সর্ব্বানন্দের এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। তিনি সদানন্দ, স্থিরচিত্ত, মৌনব্রত ও নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। আরও একটা আশ্চর্য্য ঘটনা শুনুন।

আমি তাঁহাকে শীতনিবারণের জন্য একখানি বহুমূল্য পট্টবস্ত্র প্রদান করিয়াছিলাম। সেই সদানন্দ পুরুষ উহা একজন বারবণিতাকে দিয়া ফেলিলেন। এজন্য তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বেরা তাঁহাকে তিরস্কার করেন। তিরস্কারে মর্ম্মাহত হইয়া তিনি তাঁহার ভাগিনেয় ষড়ানন্দকে তাঁহার গৃহিণীর নিকটহইতে উক্ত বস্ত্র আনিতে বলিলেন। ষড়ানন্দ বাড়ী গিয়া তাঁহার মাতুলানীর নিকট বস্ত্র চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতুলানী তখন গৃহে ছিলেন না, কার্য্যান্তরে অন্যত্র গিয়াছিলেন। ষড়ানন্দ তাহা জানিতে না পারিয়া মাতুলের রোষভয়ে পুনঃ পুনঃ সেই

বস্ত্র চাহিতে লাগিলেন। তখন সেই গৃহাভ্যন্তর হইতে একখানি হেমমণিময়কঙ্কনভূষিত দিব্যহস্ত সেইরূপ আর একখানা পট্টবস্ত্র বাহির করিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। ষড়ানন্দ উহা ভক্তবৎসলা দেবীর হস্ত বলিয়া চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বানন্দের ভ্রাতা আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি পাগলের মত ও কি বকিতেছ? আর এই পট্টবস্ত্রই বা কোথা হইতে আসিল?"

ষড়ানন্দ বলিলেন, "যে মহাত্মা নীলাচল, বদরিকাশ্রম, গঙ্গা, বারাণসী, কামাখ্যা প্রভৃতি স্থানে ভগবতীর দর্শনকামনায় উগ্র তপস্যা করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, পরে যিনি সম্প্রতি মেহার পীঠস্থলে জগদম্বিকার দশবিধ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন, যাঁহার প্রতি অসাধারণ কৃপা-প্রদর্শন করিয়া জগজ্জননী তাঁহার পদনখের স্বল্পমাত্র কিরণরেখাবিকাশে অমা-নিশাকে পূর্ণিমাবৎ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি পুনর্ব্বার কৃপাপরবশ হইয়া ভগবতী এই মাত্র স্বীয় মণিকাঞ্চনভূষিত দিব্যহস্ত প্রসারণ করিয়া এই পট্টবস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। আমি বিশ্বমাতার এই লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারই স্তব করিতেছি।"

এই কথা শুনিয়া সর্ব্বানন্দ-সহোদর আগমাচার্য্য বেশ্মালয় হইতে সেই রাজদত্ত পট্টবস্ত্রখণ্ড আনাইয়া এই দেবীদত্ত বস্ত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিলেন। এই দুই খানি বস্ত্রই ঠিক একরূপ দেখিয়া সকলে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন।

সর্ব্বানন্দ বেশী দিন গৃহে বাস করিলেন না। বোধ হয় তাঁহার স্বজনবর্গ তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া অবজ্ঞা করাতে তিনি তাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ণানন্দ ও ষড়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার পত্নী বল্লভাদেবী অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইল না। পুত্র শিবনাথ তাঁহার অনেক স্তবস্তুতি করিলেন। তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া, তিনি তাঁহাকে স্বীয় সিদ্ধি-লাভের মূলীভূত সেই মূলমন্ত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি সেনহাটীগ্রামে গিয়া অন্য দারপরিগ্রহ করেন। সেখানে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাস করিয়া, পরে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ৺কাশীধামে গিয়া অবধূত আচার অবলম্বন করিয়াছেন।"

দাসরাজার উক্তি এখানে শেষ হইল। এই দাস বংশ পূর্ব্বকালে মেহার পরগণার রাজা বা জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের এলাকা কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই বংশে শিবানন্দ খাঁ ও সদানন্দ খাঁ এই দুই সহোদর জন্মিয়াছিলেন। সদানন্দ অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। জ্যেষ্ঠ শিবানন্দই রাজ্যশাসন করিতেন। একদা শিবানন্দ শুনিলেন, তাঁহার গুরু সুরাপান করিয়া পূজা মণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন। তিনি তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য গোপনে গুরুগৃহে গমন করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ গুরুদেব তাহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাকে শাপ দিলেন—"পাপাত্মা, তোর গুরুকে অবিশ্বাস! আজই সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে

তোর মুণ্ডচ্ছেদ হইবে।” অভিশপ্ত শিবানন্দ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন এবং মহিষীকে সব কথা বলিলেন। সেই সময়ে অনেক মগ মেহারে বাস করিত। সেই দিন অপরাহ্ন সময়ে কয়েকজন মগ পরস্পর বিবাদ করিয়া রাজার নিকট বিচার-প্রার্থী হইয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে একজন মগ রাজার বিচারে পরাজিত হইয়া রাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিল। শিবানন্দের পত্নী শোকে অধীরা হইয়া গুরুদেবের শরণাপন্ন হইলেন। অনুতপ্ত গুরু কহিলেন—“মা! তোমার গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে, এই গর্ভে একটি কন্যা জন্মিয়াছে। কিন্তু তুমি এই মৃন্ময় শিবলিঙ্গের শিরঃস্থিত বজ্রটি ভক্ষণ কর, তাহা হইলে তোমার সেই কন্যাই পুত্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হইবে তাহা হইলে তোমার বংশরক্ষা হইবে।” রাণী তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। গুরু তাঁহার নাভিমূলে করস্পর্শ করিয়া বলিলেন, “এই পুত্রটির মস্তকে একটি জটা থাকিবে, তাহার নাম জটাধর রাখিও।” কালক্রমে এই জটাধরই জটাধর মল্লিক নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রই সর্ব্বানন্দের সমসাময়িক “দাসরাজা”। দাস রাজার বংশধরগণ এখন মেহার, শ্রীপুর ও সাহাপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। এখন ইঁহারা কায়স্থ বলিয়া পরিচিত। এখন ইঁহাদের জমিদারী নাই, সামান্য তালুকদারী ও চাকুরি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন।

সর্ব্বানন্দের বংশধরগণ এখন মেহার, সোমপাড়া (নোয়াখালী), সেনহাটী (খুলনা) প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।